পাতালপুরের দিগ্বিজয়ী

সমুদ্রের রহস্য প্রণেতা

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য এম,এ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

প্রকাশক
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা

দাম আট আনা

প্রিণ্টার—এস, মজুমদার
দেব প্রেস
২৪নং ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা

গোড়ার কথা

এ বইয়ে পিঁপড়ে বা "পাতালপুরীর দিগ্বিজয়ীদের" কথা বলা হয়েছে। পিঁপড়েদের সঙ্গে যদি আর কারুর তুলনা করা চলে, সে হচ্ছে মানুষ। অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে মৌমাছিরাও অনেকটা পিঁপড়েদের সঙ্গে মেলে, কিন্তু সে সামান্য।

মানুষ তো সৃষ্টির নবতম দান। তার জন্ম তো সেদিন। কিন্তু পিঁপড়ের সন্ধান পাওয়া যায় তিন কোটী বছরেরও আগে। প্রস্তরীভূত পাইনের রসের মধ্যে বদ্ধ পিঁপড়েদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে হুইলার বলেছেন: প্রায় তিন কোটী বছরের পর থেকে পিঁপড়েদের দৈহিক বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। সেই সময় থেকেই এই পিঁপড়েদের মধ্যে জাতি বিভাগ ছিল। তখন থেকেই তারা গাছের পোকাকে 'গরু'রূপে ব্যবহার করতো, অতিথি ও পরগাছাদের পুষতো। এখনকার পিঁপড়েদের মধ্যে ও তিন কোটী বছরের আগেকার পিঁপড়েদের মধ্যে খুব সামান্যই প্রভেদ আছে।

খুব কম করে ধরলেও পিঁপড়েদের আবির্ভাব কাল প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিমতম মানুষের অন্তত পাঁচগুণ আগে। কিন্তু যদি ভূতত্ত্বের প্রাচীনতম স্তরবিভাগ কাল পিঁপড়েদের জন্ম সময় বলে ধরা হয় (তার অবশ্য প্রমাণও পাওয়া যায়) এবং প্রস্তর যুগকে মানুষের জন্মকাল বলে স্থির করা হয়, তাহলে মানুষের চেয়ে অন্তত: একশগুণ সময় আগে পিঁপড়ের জন্ম হয়েছিল বলে মানতে হয়। অর্থাৎ

—দুই—

পিঁপড়েরা যখন তাদের পরিপূর্ণ সামাজিক প্রবৃত্তি নিয়ে এই পৃথিবীর বুকে স্বচ্ছন্দে চরে বেড়াতো, তখন মানুষের নাম গন্ধও এই পৃথিবীতে পাওয়া যেতো না। যে মানুষ এখনকার এই পৃথিবীর কর্ত্তা, তখনকার দিনে বন্য জীবজন্তুর মধ্যে তার আবির্ভাবের বীজ গোপনে বপন হচ্ছিল।

জন্মকালের এই অসাধারণ প্রভেদের জন্য পিঁপড়ের ও মানুষের সামাজিক জীবনে এত প্রভেদ হয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি যে প্রায় তিন কোটা বছরের আগে থেকে পিঁপড়েদের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। কিন্তু আমরা জানি মানুষের জন্ম থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক দিনই মানুষের সমাজের পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এই পরিবর্ত্তনের কমবার কোন নামই নেই বরং এখনো কত কাল যে এর কত রকমের পরিবর্ত্তন হবে তার সীমা নেই। জন্ম হওয়া মাত্রই পিঁপড়ের পূর্ণ বিকাশ হয়, তখন থেকেই সে জানে তার নিজের কর্ত্তব্য কি, সমাজে তাকে কি ভাবে চলতে হবে। তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে জগতের সুমুখে দাঁড় করিয়ে তাদের চরমতম জ্ঞান ও শক্তি আপনা হতেই শিখিয়ে দেয়—তার জন্য আর কারুর কাছে কোন শিক্ষা গ্রহণ করবার দরকার হয় না। কিন্তু মানুষের বেলায় তা' খাটে না। সে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত শিশু। তাকে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত শিখতে হয়, কি করে সমাজে চলতে হবে, কার কি কর্ত্তব্য। কি করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তাকে খাপ খাওয়াতে হবে, কি ভাবে দাঁড়াতে হবে, কি ভাবে কথা কইতে হবে, এক কথায় তার জীবন মরণের সকল

সমস্যার সমাধানের শিক্ষা বাইরে থেকে তাকে শিখতে হয়—কিন্তু সকল শিক্ষাই তার অসম্পূর্ণ। মানুষকে হাজার হাজার বছরের পরীক্ষার ভেতর দিয়ে চলতে হয়েছে এবং চলতে হবে—তবুও সে হয়তো সামাজিক জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। কিন্তু মানুষের চেয়ে বহু পুরাতন হওয়ার জন্য পিঁপড়েদের জীবনে সামাজিক-পরীক্ষা প্রায় তিন কোটী বছর আগে শেষ হয়ে গেছে এবং বহু পরীক্ষার ফলে তার সামাজিক অসম্পূর্ণতা শেষ হয়ে গিয়ে একটা চরম পূর্ণতা এসে গেছে। তারা এখন সকলেই "বুদ্ধ" হয়ে গেছে এবং এই জ্ঞান তাদের বংশানুক্রমে আচার ব্যবহারের দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তিরূপে তাদের জীবনে স্থান পেয়েছে। তাই জন্ম থেকেই পিঁপড়ে জানে—"তার পথ কি।" কিন্তু মানুষের শিক্ষা এখনো শেষ হয় নি, তাই সে যুগে যুগে জিজ্ঞাসা করছে "কঃ পন্থা ?" (পথ কি ?)

এই জগতে মানুষের প্রধান অস্ত্র বুদ্ধি। এই বুদ্ধির সাহায্যে সে আপনাকে জীব জগতের শ্রেষ্ঠ ভাবে। পিঁপড়েদের জীবনে বুদ্ধির স্থান নেই ; তার পরিবর্ত্তে আছে সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিই তাকে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে তাকে জয়মাল্য পরিয়েছে। এই প্রবৃত্তির জন্যে তার প্রত্যেক কাজটাই সম্পূর্ণ। তার শিকার, তার হুলের ও দাড়ার ব্যবহার, প্রত্যেক কাজটী নিখুঁত। কিন্তু মানুষের যে সব অস্ত্র, তার ব্যবহারে মানুষ ঠিক এই ভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ এই জন্যই বুদ্ধির চেয়ে সহজাত প্রবৃত্তির উৎকর্ষ স্বীকার করেন।

পিঁপড়েদের জাতি বিভাগের মূলে দৈহিক গঠন। দেহ

ও মস্তিষ্কের গঠন অনুযায়ী এদের শ্রম বিভাগ হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন জাতি দৈহিক গঠনের একটা বিভিন্ন নমুনা। যোদ্ধা পিঁপড়েদের সকলের চেয়ে ছোট কর্ম্মীরা পুরুষ বা রাণী পিঁপড়ে-দের ওজনের প্রায় একশগুণ কম। এবং আকৃতিতেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। চাষী পিঁপড়েদের যোদ্ধাদের মাথা সাধারণ পিঁপড়েদের মাথার ৩০।৪০ গুণ বড়। কিন্তু ওদের কর্ম্মীদের মাথা সাধারণ ও স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ জন্মগত, দৈহিক-বিশেষত্ব বশতঃ হয় না। শিক্ষা ও কর্ম্মবশতঃ হয়। যে সব দেশে জন্মগত জাতিবিভাগ আছে (যেমন ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে) সেখানে মানুষের জাতিগত কর্ম্ম অনুসারে দৈহিক পরিবর্ত্তন বড় দেখা যায় না। একজন ব্রাহ্মণের দৈহিক গঠন একজন সাধারণ শূদ্রের দৈহিক গঠনের সঙ্গে বিশেষ কিছুই প্রভেদ নেই, যেমন পিঁপড়েদের মধ্যে রাণীর দৈহিক গঠন ও কর্ম্মীর দৈহিক গঠনে আছে। পিঁপড়েদের কর্ম্মীর বা যোদ্ধার কর্ম্ম অনুসারে তাদের শরীরে যন্ত্রপাতি বা অস্ত্রশস্ত্র প্রকৃতি নিজেই নির্ম্মাণ করে দিয়েছেন, কিন্তু মানুষের বেলায় তা হয়নি। শূদ্রের হাতে আপনি কোদাল এসে জন্মায়নি, বা ক্ষত্রিয়ের হাতে তরোয়াল জন্মায়নি। মানুষকে তা' নিজেদের সুবিধানুযায়ী তৈরী করতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের অস্ত্রশস্ত্র পিঁপড়েদের মত অব্যর্থ হয়নি। মানুষকে ভেবে চিন্তে বুদ্ধির সাহায্যে যে কাজ ক'রে ব্যর্থমনোরথ হতে হবে পিঁপড়েরা সেখানে না ভেবে প্রবৃত্তির সাহায্যে সে কাজে অনায়াসে জয়লাভ করবে।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড :—

দ্বিতীয় খণ্ড :— —

তৃতীয় খণ্ড ঃ—

ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত দুইটি প্রবন্ধ এবং হাক্সলির "Ants" নামক পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। ছবিগুলি ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন হইতে গৃহীত।

—গ্রন্থকার

পিঁপড়েদের পার্লিয়ামেণ্ট

পাতালপুরের দিগ্বিজয়ী

পিপীলিকার স্বভাব

পিপীলিকা বা পিঁপড়ে দেখনি তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই।

এদের দেখলে মনে হয়, এরা কি শান্ত, কি নিরীহ! কিন্তু এক এক শ্রেণীর পিপীলিকা শান্ত ও নিরীহ হলেও এদের মধ্যেই ভীষণ নিষ্ঠুর জাতও আছে। এই সব পিপীলিকারা নিজেদের দলের বাছা বাছা হিংস্র সৈন্যদের একত্র করে সারা জীবন ধরে কেবল অন্যান্য পিপীলিকাদের উপর অত্যাচার করে বেড়ায়; এরা তাদের বাসা ভেঙে বাসায় যত প্রাণী আছে সকলকে হত্যা করে বেড়ায়। এতেই এদের আমোদ।

এমন সব রাণী পিপীলিকা আছে যারা অপর রাণী পিপীলিকার রাজ্যে সসৈন্যে প্রবেশ করে তাদের সৈন্যের

সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং শেষে সেই রাজ্যের রাণীকে হত্যা করে তার রাজ্য দখল করে।

এমন সব পিপীলিকাও আছে, যারা অপরের বাড়ী, ঘর, দোর দখল ক'রে তাদের বাচ্চাদের ধরে নিয়ে যায় নিজেদের দাস করবার জন্য।

বাগানতৈরী ও "গরু" পোষা

মানুষদের মধ্যে যারা সভ্যতায় খুব উঁচু তারা মারামারি কাটাকাটি ভালবাসে না। তারা নিজেরা চাষবাস করে ও শান্ত শিষ্ট হয়ে বাস করে। পিপীলিকাদের মধ্যেও তেমনি যারা সভ্যতায় খুব বড়, তারা নিজেদের বাগান তৈরী করে, নিজেদের উপযুক্ত শস্যের চাষ করে। এদের মধ্যে "গোয়ালা" জাতের পিপীলিকারা গরু পোষে। কেউ কেউ মধু সংগ্রহ করে এবং একরকম পিপীলিকা আছে তাদের পেটে মধু বোঝাই করে ঘরের ছাতে ঝুলিয়ে রেখে দেয়। আবার কেউ কেউ নিজেদের বাচ্ছাদের লালা দিয়ে তৈরী সুতো দিয়ে বেশ সুন্দরভাবে বাসা তৈরী করে।

ছবিতে পিঁপড়েদের যুদ্ধ দেখ। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে তাদের ডিম নিয়ে পালাচ্ছে।

পিপীলিকা-জগৎ

জগতের এমন স্থান নেই যেখানে একটিও পিপীলিকা নেই। বোধহয় জীবিত প্রাণীদের মধ্যে পিপীলিকারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০০ জাতের পিপীলিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। এক এক জাতির মধ্যে আবার বহু শ্রেণী বিভাগ আছে। শীতের দেশে এদের সংখ্যা কম ; গরম দেশে বেশী।

আমাদের দেশে পিপীলিকা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয় নাই। কিন্তু য়ুরোপ, আমেরিকায় ও সম্বন্ধে অনেক গবেষণা ও কাজ হয়েছে। তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে আমেরিকাতে একমাত্র বেলজিয়ান্ কঙ্গোয় পিপীলিকা সম্বন্ধে একখানা ১১৩৯ পাতার বই লেখা হয়েছে।

৩০ লক্ষ বছর আগে যে সব পিপীলিকা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াত, তাদের সম্বন্ধে মোটা মোটা বই লেখা হয়েছে। মাটীর নীচে থেকে এদের পাথরে পরিণত মৃত দেহ অনেক সময় পাওয়া যায়। তা থেকে এদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করা হয়।

তোমাদের বাগানে, ঘরের কোণে, রান্নাঘরে ও ভাঁড়ার

দর্জ্জি পিঁপড়ে

বাসা তৈরী করবার সময় এরা একদল মুখ দিয়ে পাতা টেনে ধরে : আর একদল বাচ্চাদের লালা দিয়ে পাতা জোড়ে। পাতা জোড়ার কাজ হয়ে গেলে বাচ্চারা মরে যায়।

উপরের ডানাওয়ালা বড়টী রাণী পিঁপড়ে আর ছোটটি পুরুষ।

ঘরের দিকে লক্ষ্য রেখ তাহলে ওসব জায়গায় পিপীলিকাদের মস্ত বড় বড় অনেকগুলি রাজ্য, সহর, উপনিবেশ প্রভৃতি দেখতে পাবে।

একরকম হল্‌দে পিপীলিকা আছে এরা জাহাজে ষ্টিমারে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে এবং পৃথিবীর সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এই সব পিপীলিকারা গরম ঘরে থাকতে ভালবাসে। এরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রাণী হলেও শীতপ্রধান দেশে উপনিবেশ স্থাপন ক'রে সব জায়গায় জ্বালাতন করে বেড়ায়।

বাগানে ও খেলার মাঠে একরকম পিপীলিকা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এরা সখের বাগান থেকে আরম্ভ করে খেলার মাঠের পর্য্যন্ত ভীষণ ক্ষতি করে বেড়ায়। পৃথিবীর উত্তর অঞ্চলেই এদের বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

এক পশলা বৃষ্টি হবার পর তোমরা নিজেদের বাগানে গিয়ে যে কোন একটা বড় ইঁট বা কাঠ উল্‌টে ফেলে দাও, তাহলে হয়তো দেখতে পাবে একটী প্রকাণ্ড পিপীলিকার সহর। এর মধ্যে অনেক রাস্তা পথ ঘাট সুড়ঙ্গ, তার মধ্য দিয়ে অনেক উত্তেজিত পিপীলিকার ভিড় দেখতে পাবে। হঠাৎ এদের বাসা আবিষ্কার হওয়ার জন্য এরা ভারী রেগে গেছে। এদের মধ্যে দেখতে পাবে একটী খুব বড় পিপী-

লিকা। ইনি হচ্চেন এদের রাণী। আবার যদি এদের সহরটী খুব বড় হয়, তা' হলে অনেকগুলি বড় বড় রাণী
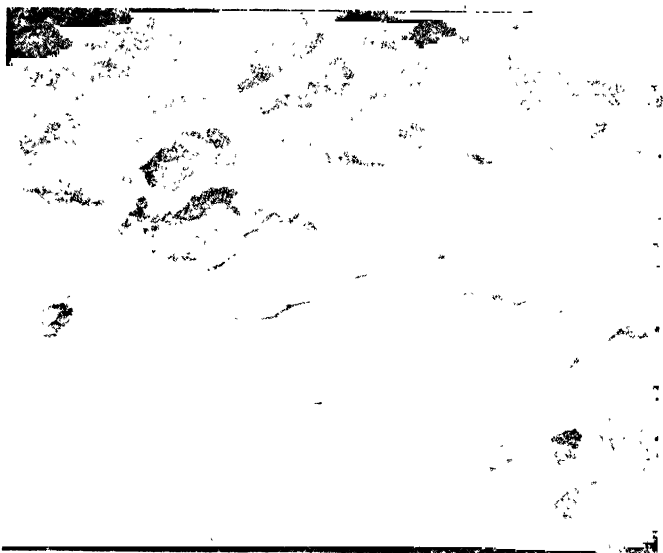
পিপীলিকা নগরীর মিউনিসিপ্যালিটি

পিপীলিকা নগরের রাস্তাগুলি খুব পরিষ্কার রাখা হয়। একটি টালী উল্‌টে এমন একটি সুন্দর পিপীলিকা নগরীর আবিষ্কার হইল। নগর-বাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য থাবারের পরিত্যক্ত অংশ, ডিম ভাঙ্গা, মৃত পিপীলিকা বা আবর্জ্জনা সহরের বহুদূরে, যেথানে পিপীলিকা বাস করে না, সেথানে ফেলে দেওয়া হয়।

পিপীলিকা দেখতে পাবে। এদের সহরে সব সময় পুরুষ পিপালিকা দেখতে পাওয়া যায় না। আর যদি যায়

তাহলে দেখতে এরা সকল পিপীলিকার চেয়ে খুব ছোট এদের গায়ের রং কালো আর এদের পিঠে ডানা।

তোমাদের চোখের সামনে দিয়ে বাচ্চা পিপীলিকারা হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে। হয়তো দেখবে একজায়গায় অনেকগুলি সাদা সাদা ময়দার মত জিনিষ একসঙ্গে জড়ো করা রয়েছে। এগুলি আর কিছু নয়, পিপীলিকাদের ডিম। অনেক সময় বড় বড় লাল পিঁপ্ড়েদের ডিম পিপে পিপে সংগ্রহ করা হয়। আর মাছ ধরবার জন্য নানা দেশ-বিদেশে এদের চালান দেওয়া হয়।

অনেক সময় এই বাসার মধ্যে লালধরণের অনেকগুলি লম্বা লম্বা পোকা দেখতে পাবে। এরা হচ্ছে এই রাজ্যের অতিথি। পিঁপড়ে গৃহস্থেরা এদের এত ভালবাসে যে এদের সাধারণের শস্য-ভাণ্ডার থেকে বা সাধারণের "উদর ভাণ্ডার" (অর্থাৎ পেটের থলিতে জমানো খাবার) থেকে এদের খাবার খেতে দেয়। এর ফলে চার পাঁচটি এইরকম অতিথি এক একটী পিঁপড়ের রাজ্যে ঢুকতে পারলেই একেবারে গোটা সহর এদের খাদ্য জোগাতে গিয়ে সাবাড় হয়ে যায়!

এদের রাস্তার উপর দিয়ে হয়তো দেখবে অনেক শিকড় চলে গেছে। এই সকল শিকড়গুলি ভালভাবে লক্ষ্য

করলে দেখতে পাবে অনেকগুলি ছোট ছোট পোকা এই সব শিকড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলি আর কিছু নয়, এগুলি হচ্ছে পিঁপড়েদের "গরু"।

গ্রীষ্মকাল পড়লে এদের অন্যান্য গাছের শিকড়ের উপর "চরাণ" হয় কখন বা চাষাদের ক্ষেতের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এরা তখন চাষাদের শস্যের বড় ক্ষতি করে। এসব ব্যাপারে পিঁপড়েরাই দায়ী বেশী।

আমরা যেমন দুধ দোহাই, সেইভাবে পিঁপড়েরা এই সকল পোকাদের আস্তে আস্তে শুড়শুড়ি দেয়; তার ফলে তাদের পেট থেকে একরকম মধুর রস বেরিয়ে আসে। সেই রস পিঁপড়েরা মজা করে খায়। এই মধুর রস হচ্ছে গাছের বা পাতার মধু। এই মধু পোকারা চুষে পেটটা বোঝাই করে। কিছু নিজেরা খায় আর বাদবাকী পেটের থলির মধ্যে গিয়ে জমা হয়।

এই মধু অনেক পিঁপড়ের প্রধান খাদ্য। এইজন্যে এরা গয়লাদের মত অনেক "গরু" পোষে এবং খুব যত্ন করে এদের পালন করে, শিকড়ে শিকড়ে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অনেক সময় পিঁপড়েরা গাছের গুঁড়ির ওপর পাতার বা কাগজের মত জিনিষের ঘর তৈরী করে তার মধ্যে এই সকল গরুদের রেখে দেয়।

শীতকাল এলে পিঁপড়েরা এই গরুদের নিজেদের বাসার মধ্যে নিয়ে যায় ; সেখানে শিকড়ের উপরে তাদের রেখে দেয়। আবার যখন ঠাণ্ডা কেটে যায় মাঠে জঙ্গলে বেশ কচি কচি পাতা জন্মায় সেই সময় তাদের সেখানে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বসন্তকালে প্রায়ই পাড়াগাঁয়ের রাস্তার দুধারে লতাপাতা গাছপালার ওপর এই সকল পিপীলিকাকে দলে দলে তাদের গরু চরাতে দেখতে পাওয়া যায়।

ইঁটের তলার বাসাটী ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, অনেকগুলি খুব ছোট ছোট পিঁপড়ে রয়েছে। এই পিঁপড়ের নাম বলতে পার "চোর পিঁপড়ে"। এই পিঁপড়েরা বড় পিঁপড়েদের বাসায় খুব সরু সরু সুড়ঙ্গ তৈরী করে। সেই সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে এসে বড় পিঁপড়েদের খাবার চুরি করে নিয়ে পালায়। সেই সুড়ঙ্গগুলি এত সরু যে, বড় পিঁপড়েরা তাদের পিছু পিছু দৌড়তে পারে না। আমরা যদি কোন ইঁদুরকে তাড়া করি আর সে তার গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন আমরা যেমন সেখানে আর ঢুকতে পারি না সেইরকম ভাবে এইসকল ছোট পিঁপড়েরা বড় পিঁপড়েদের নানা-রকম উৎপাত করে নিজেদের গর্ত্তমধ্যে ঢুকে পড়ে। বড়রা তাদের কিছুই করতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় যখন এইসব ছোট পিঁপড়েদের অত্যাচার বেড়ে

যায়, তখন বড়রা দল বেঁধে ওদের সুড়ঙ্গ ভাঙ্গতে সুরু করে দেয়। তখন ছোটদের সঙ্গে বড় দলের যুদ্ধ বাঁধে। ছোটরা বড়দের গলা আঁকড়ে ঝুলতে থাকে ; বড়রা তাদের কামড়ে মেরে ফেলে দেয়।

অন্ধ পিপীলিকা

অনেক সময় পোড়ো বাড়ীর ইঁট কাঠের নীচে অন্ধকার জায়গায় একদল পিঁপড়ে বাস করে ; যদি তাদের বাসার ওপরকার ইঁট উল্টে দাও তাহলে হয়তো প্রথমে কিছুই দেখতে পাবে না। আলোয় ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে দেখতে পাবে অনেকগুলি কাল কাল পিঁপড়ে চুপ করে রয়েছে। এরা অন্ধ ; এদের চোখ নেই ; কাজেই, যখন এদের শত্রু আসে তখন এরা বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করে না।

রাণী পিপীলিকার অদ্ভুত ক্ষমতা

প্রায় সকল পিঁপড়ের রাজ্য অনেকটা এক ধরণের। ওদের নিয়মকানুনের বিশেষ তফাৎ নেই। এদের রাজ্যের

সকল প্রজাই রাণীর সন্তান। অবশ্য অতিথি অভ্যাগত ও দুই একজন বাইরের লোক ছাড়া এই রাণীর সবাই ছেলেপিলে।

রাণী যখন জানতে পারে, এইবারে সে ডিম পাড়্‌বে তখন সে আস্তে আস্তে কোন ইঁটের বা গাছের ছালের নীচে বাসা করে। কখন কখন গাছের ছাল চিবিয়ে কাগজের মত করে নিজের বাসা তৈরী করে। তারপর রাণী প্রথম ডিম পাড়ে। এখন মজা হচ্চে এই, এই রাণী যখন পিঁপড়ে অবস্থা পাবার আগে নিজে গুটিকার মধ্যে ছিল তখন তার গায়ের বাসার মধ্যে তাকে কর্ম্মীর দল অনবরত সেবা-শুশ্রূষা করেছিল। তাকে একরকম অদ্ভুত ধরণের খাবার দেওয়া হয়, সেই খাবার খেয়ে সে খানিকটা করে নিজের শরীরের মধ্যে জমা করে রাখে। ডিম পাড়বার এই প্রথম সময়টীর জন্য তার ডানার মাংসপেশী অসাধারণ ভাবে বাড়তে থাকে। আর তার তলপেটের মাঝে বাড়তি খাবার মেদ হয়ে সঞ্চিত থাকে।

ডিম পাড়ার আগে তার ডানা গজায়, আর সে ওড়ে, কিন্তু, যখন সে ডিম পাড়ে তখন তার আর ডানার কোনই প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং রাণী আঁচড়ে কামড়ে ডানা দুটী ছিঁড়ে ফেলে। ডানার মাংসপেশী আর বাড়তে পারে

না। তার ফলে সঞ্চিত মেদ আরও বাড়তে থাকে। যখন তার প্রথম সন্তান হয়, তখন সে পেট থেকে সেই মেদ মুখ

সাধারণের শত্রু

এরা খেলবার 'লন' নষ্ট করে খাবার চুরি করে নিয়ে যায় এবং ভীষণ ভাবে হুল ফুটিয়ে দেয়।

পৃথিবীর সব জায়গায় এদের পাওয়া যায়। বাঁদিকের পিঁপড়েরা গলফ খেলবার মাঠময় বাসা করে বেড়ায়। ডানদিকের উপরের ছবিতে বাড়ীতে যে ছোট ছোট লাল পিঁপড়ে (খুদে পিঁপড়ে) দেখা যায় তারা চিনি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। ডানদিকের তলার ছবিতে যে লাল পিঁপড়ে দেখা যাচ্ছে, ওদের কামড় ভীষণ —গা জ্বলিয়ে দেয় একেবারে।

দিয়ে বার করে সন্তানকে খাওয়ায়। সেই সন্তান অবশ্য বড় হলে ভারী দুর্ব্বল হয়, কিন্তু তা হলে কি হয়, তারা

পিঁপড়ে ভিন্ন তো আর কিছু নয়। পিঁপড়ের যা কিছু প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হয়। তারা মার জন্য ও মার অনবরত প্রসূত সন্তানের জন্য খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।

এইভাবে একটী সম্পূর্ণ পিপীলিকার উপনিবেশ গঠিত হয়। রাণীর যখন বিপদ আপদ সব কেটে যায় তখন সে নিশ্চিন্ত মনে সারা জীবন ধরে ডিম পাড়তে থাকে। তখন সে কেবল ডিম পাড়বার যন্ত্র হয়ে পড়ে। তার ছেলেপিলেরা তাকে খুব যত্ন করতে থাকে।

গ্রীষ্মের শেষে ও বর্ষার আরম্ভে ঝাঁকে ঝাঁকে পিপীলিকাদের উড়্‌তে দেখা যায়। গর্ত্তের ভিতর থেকে, দেওয়ালের ফাটাল থেকে, গাছের গুড়ির ভেতর থেকে, যেখানে যত পিপীলিকার বাসা আছে সব জায়গা থেকে দেখতে পাওয়া যায় ডানাওয়ালা পিপীলিকারা সব দল বেঁধে বেরুচ্ছে। এই সময়টীর পরই এদের ডিম এবং বাচ্চা হয়। এইজন্য দলে দলে স্ত্রী ও পুরুষ পিপীলিকারা আকাশে উড়ে বেড়ায়।

ঠগী পিঁপড়ে বা দস্যু পিপীলিকা ও তাহার দলবল

যদিও প্রায় সকল পিপীলিকার উপনিবেশই একটী মাত্র স্ত্রী পিপীলিকার দ্বারা গড়ে উঠে, তা'হলেও একজাতীয় পিপীলিকা আছে তারা উপনিবেশ গড়ে না। তাদের নাম দস্যু পিপীলিকা—এদের এসিয়া মহাদেশ ও উত্তর আমেরিকায় দেখতে পাওয়া যায়।

এই দস্যু পিপীলিকার রাণীর যখন ডিম পাড়ার সময় হয়, তখন সে স্থানান্তরে উপনিবেশ গড়বার জন্য চলে যায়। তখন তা'র পা যদি খুব ভাল আতসীকাঁচ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়, তা হ'লে খুব ছোট ছোট কর্ম্মী পিপীলিকা-দের একটি বাহিনী রাণীর পায়ে দাঁড়া দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে দেখা যাবে। যখন রাণী নূতন উপনিবেশ স্থাপন করবে তখন এরা তাকে সাহায্য করবে।

এই সকল দলের অনেক পিপীলিকা আছে, যারা অদ্ভুত উপায়ে নিজেদের রাজ্য গঠন করে। এরা নিজেদের প্রথম সন্তানকে ঠিক মত পালন করতে পারে না। এইজন্য এরা প্রায়ই নিজেদের সম জাতীয় পিপীলিকার উপনিবেশ হঠাৎ আক্রমণ করে এবং তাদের ডিম জড় করে'

চুরি করে নিয়ে দৌড়ায়। এদের সঙ্গে তখন ওই উপনিবেশের পিপীলিকার সঙ্গে খুব যুদ্ধ বাঁধে।

যখন ডিম থেকে পিপীলিকা ফুটে, তখন তারা তাদের এই অপহরণকারিণী মায়ের প্রতি খুব অনুরক্ত হয়। তা'রা খুব যত্ন করে রাণীর সন্তানদের সেবা করে। এর ফলে এক একটী উপনিবেশে মিশ্র জাতীয় পিপীলিকার সৃষ্টি হয়।

এক শ্রেণীর পিপীলিকার দলে স্ত্রী জাতীয় ছোট ছোট পিপীলিকা থাকে। তাদের গায়ে নরম হলুদ বর্ণের লোম আছে। তারা তাদের সম জাতীয় অন্য এক রাজ্যে প্রবেশ করে সেখানের কর্ম্মীদলের সঙ্গে মিশে যায় এবং তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ঐ রাজ্যের রাণীকে হত্যা করে এবং নিজেদের একজনকে রাণীর জায়গায় বসায়। ঐ রাজ্যের কর্ম্মীরা তখন নূতন রাণীকে পূর্ব্বের রাণীর মতই সেবা করতে আরম্ভ করে এবং তার শিশু সন্তানদের পালনে মন দেয়। ক্রমে ক্রমে ঐ রাজ্যের আদিম অধিবাসীরা মারা যায় এবং রাজ্যটী সম্পূর্ণ ভাবে আক্রমণকারী বিদেশী পিপীলিকার হাতে চলে যায়।

"খুনে"-পিঁপড়ে

একদল "মাথা কাটা" পিপীলিকা উত্তর আফ্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা "গাঁট কাটা" লোকের পরিচয় পাও। তারা পরের গাঁট কেটে বেড়ায়। কিন্তু এই "মাথা কাটা" পিপীলিকারা গাঁটকাটাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর। গাঁটকাটারা কেবল পকেট মেরে চুরি ক'রে বেড়ায়। পথিককে হত্যা করে না। কিন্তু এই "মাথা কাটা" পিপীলিকাদের স্বভাব বড় ভয়ঙ্কর। "মাথাকাটা"দের রাণী কি করে জানো?

হঠাৎ একদিন তিনি উড়ে আর একদল বড় পিপীলিকার বাসার কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। টপিনোমা পিপীলিকাদের কর্ম্মীর দল তাকে দেখে ধরে নিয়ে বাসার মধ্যে পুরে রেখে দেয়। কোনও কারণ বশতঃ তাকে তারা কিছুদিন খায় না। এই সুযোগ পেয়ে ঐ রাণীটী বাসার রাণীর পিঠে চড়ে বসে এবং দাঁত দিয়ে মাথাটী কেটে ফেলে দেয়। টপিনোমার কর্ম্মীরা তখন তাকেই রাণীত্বে বরণ করে এবং তার ডিম ও বাচ্চাদের যত্ন করতে আরম্ভ করে দেয়। ক্রমে ক্রমে এই নবাগত রাণীর বাচ্চায় বাসাটী পূর্ণ হয়ে যায়।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী পিপীলিকার জন্ম হয়। রাণীরা আবার উড়ে যায়। আর একটী টপিনোমার বাসা খুঁজে বার করে এবং এই ভাবে সেখানে নিজেদের "রাণীত্ব" বিস্তার করে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় টপিনোমারা এখনও কি ভাবে বেঁচে আছে! তবে এই "মাথাকাটাদের" যেমন অত্যাচার, এর ফলে ওদের আর বেশী দিন বাঁচতে হচ্ছে না। কিন্তু আরো মজা এই যে, যদি টপিনোমারা না বাঁচে তা'হলে এই মাথা কাটাদেরও মরণ ঘনিয়ে আসবে। কেননা এই "মাথাকাটা রাণীর"জাত টপিনোমা ভিন্ন বাঁচতেই পারে না।

যখন 'আমেজান'নামা পিপীলিকাদের রাণী ("মাথা-কাটা" পিপীলিকার এক শ্রেণী) দিগ্বিজয়ে বেরোয় তখন সে প্রথমেই ফর্ম্মিকা পিপীলিকাদের বাসায় ঢোকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাদের লম্বা লম্বা দাড়া দিয়ে ওই বাসার রাণীর মাথাটী কেটে ফেলে দেয় এবং ঐ রাজ্যের রাণী হয়ে বসে।

আমেজানরা তাদের যুদ্ধের উপযোগী লম্বা লম্বা ও ধারাল দাড়া দিয়ে নিজেদের সন্তান পালন করতে পারে না বা ঘরের কোন কাজ করতে পারে না। সুতরাং সময় সময় ওদের আশে পাশের রাজ্য আক্রমণ করতে ছুটতে হয়—

রাতের বেলায় বা মেঘলা দিনে ঝাঁকে ঝাঁকে “মালী[illegible]
গাছকে গাছ একেবারে নেড়া করে দেয়।
ডানদিকের ওপরের ছবিটীতে দেখতে পাবে দুটী পি[illegible]করাতের মত
দাঁত দিয়ে গাছের পাতা কাটছে। নীচে দেখ পাতা কেটে [illegible]
একদল যেন পতাকা নিয়ে মার্চ্চ করে চলেছে। একটী ছোট
পিঁপড়ে একটী বড় পিঁপড়ের ঘাড়ে পাতার ওপর
বসে চলেছে, যেন হাতীর পিঠে মাহুত।
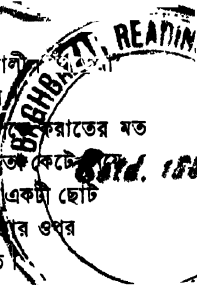
দাস সংগ্রহ করবার জন্য। এই সময় ওদের অপর রাজ্যের পিপীলিকার সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ বাধে।

আত্মরক্ষাকারী পিপীলিকারা এই আক্রমণকারী আমেজান পিপীলিকার কাছে দাঁড়াতেই পারে না।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এরা ঘর দোর আসবাব পত্রের বড় ক্ষতি করে। এরা কাঠ চিবিয়ে খায়। সকলের চেয়ে বড় ও মোটা পোকাটা হচ্ছেন রাণী মহাশয়া। এর পেট ডিমে ভর্ত্তি।

আত্মরক্ষাকারী ফর্ম্মিকা পিপীলিকাদের চোয়ালের দাঁত ছোট ছোট, দাড়াগুলো তেকোণা তাতে আবার জোর তেমন থাকে না। কিন্তু আমেজানদের চোয়াল ভারী জোরাল; তাদের দাড়া ভীষণ শক্ত আর ধারাল, তাদের শরীরেও শক্তি

অসীম। সুতরাং এই অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত ভীষণ শত্রুর কাছে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

যখন যুদ্ধ জয় করে এই আমেজানরা শত্রুর ঘর লুটপাট করে তাদের গুটিকা মুখে করে সারে সারে নিজেদের বাসার দিকে ফিরে আসে, তখন দৃশ্যটী দেখবার মত হয়। এই সকল গুটিকা থেকে নূতন নূতন দাসের সৃষ্টি হয় এবং সব চেয়ে মজা এই যে, এরাই পরে তাদের নিজেদের পুরাণো বাসাকে আক্রমণ করে নিজেদের ভাইবোনদের বন্দী করে নিয়ে আসে।

এই আমেজানদের উত্তর আমেরিকায় বেশী পাওয়া যায় এবং পশ্চিম দেশেও ওদের যাতায়াত দেখতে পাওয়া যায়।

একরকম পিঁপড়ে তোমরা বাগানে আম গাছে পেয়ারা গাছে দেখতে পাবে, এদের পেটটি লাল আর দুপাশটী কাল আবার কারও লেজটী কাল গা'টী লাল। এরা ভয়ানক কামড়ায়। যে স্থানটীতে এরা হুল ফুটায় সেই স্থানটী সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে ফুলে ওঠে, আর ভয়ানক জ্বালা করে। এদের পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রায় সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। এদের রাজ্যটী কর্ম্মী পিপীলিকায় ভর্ত্তি। এই পিঁপড়েরা গাছ পালার ভয়ানক

ক্ষতি করে। এরা এমন কি ছোট ছোট পাখী—যারা উড়তে পারে না তাদেরও কামড়ে মেরে ফেলে দেয়।

এই সকল পিঁপড়েদের জলেও কাবু করতে পারে না। অনেক সময় দেখা গেছে বন্যার জলে অনেক গাছ পালা ভেসে যাচ্চে, তাদের মধ্যেই এই পিঁপড়েরা আপনাদের কাজ নিয়মিত ভাবে করতে করতে ভেসে চলেছে।

"দর্জ্জি" পিঁপড়ে

"দর্জ্জি" পিঁপড়েরা (Tailor ant) বড়ই অদ্ভুত। পিঁপড়েদের ভেতর এর আর জোড়া মেলে না। এরা বাসা তৈরী করবার জন্য নিজেদের বাচ্চাদের যন্ত্রের মত ব্যবহার করে।

তোমরা হয়তো অনেকে এই লাল 'দর্জ্জি' পিঁপড়ের বাসা দেখেছ। পুরাণো আম গাছে প্রায়ই এদের বাসা দেখা যায়। অনেকগুলি আমপাতা পাশাপাশি জুড়ে জুড়ে থলির মত এরা বাসা তৈরী করে। যাদের মাছ ধরবার বাতিক আছে, তারা এই লাল পিঁপড়ের বাসা ভেঙ্গে নিয়ে

যায়—তার থেকে পিঁপড়ের বাচ্চা বা'র করে মাছের টোপ করে। ওতে নাকি মাছ খুব খায়। অনেক জাতের লোকেরা ওই পিঁপড়ে-বাচ্চার তরকারি বানিয়ে খায়।

কিন্তু ওই সকল বাসা এই দর্জ্জি পিঁপড়েরা কি ক'রে বানায় জান ?

খুব কম পিঁপড়েই বড় হলে জাল বুনবার সুতো তৈরী করতে পারে। কিন্তু সবেমাত্র যে সকল পিঁপড়ে ডিম থেকে ফুটে বেরোয়, সেই সকল পিঁপড়ের গুটীরা নিজেদের চারিদিকে সুতো বুনে নিজেদের তার মধ্যে বন্দী করে ফেলে। পরে এরা এই সকল গুটী ছিঁড়ে পূর্ণবয়স্ক হয়ে বেরোয়।

দর্জ্জি পিঁপড়েরাও এই গুটীদের সুতো বোনবার কাজটীকে নিজের কাজে লাগায়।

আমি একবার এই পিপীলিকাদের বাসায় হাত দিয়েছিলাম। এদের পাতায় পাতায় জোড়া বাসার একটী পাতা আমি ছিঁড়ে দিয়েছিলাম।

প্রথমে পিঁপড়েদের খুব হট্টগোলের সৃষ্টি হোল। যেন, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ব্যস্ত ভাবে এরা ঘুরে বেড়াতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে এদের ব্যস্ত ভাব আস্তে আস্তে কমে গেল। যখন শত্রুর দেখা পেল না তখন এরা বাসা মেরামত করবার কাজে লেগে গেল।

পাতালপুরের দিগ্বিজয়ী

একদল কর্ম্মী পিঁপড়ে পাতার ধার কামড়ে ধরে টানতে লাগল, আর একদল পিঁপড়ে বাচ্চাদের দাড়া-দিয়ে কামড়ে ধরে তাদের মুখটাকে পাতার ধারে ঠেকিয়ে রাখলে। পা দিয়ে বাচ্চাদের গায়ে বুলোতে ক্রমে ক্রমে ওদের মুখ দিয়ে সুতো বেরোতে লাগলো। ওই সুতো দিয়ে ক্রমে ক্রমে দুদিকের পাতার দু মুখ জুড়ে যেতে লাগল। যেমন করে লোকে কাঁথা সেলাই করে, ঠিক সেই ভাবেই এই কর্ম্মীরা এদের বাচ্চার সাহায্যে বাসাটী আগাগোড়া মেরামত করে নিলে।

কিন্তু সকলের চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, যখন এদের সুতো দিয়ে সাধারণের জন্য বাসাটী তৈরী হ'ল, তখন এই বাচ্চাদের আর ক্ষমতা থাকে না, যা'তে নিজের চারিদিকে সুতোর জাল দিয়ে ঘিরে রাখে। তার ফলে এদের মৃত্যু হয়। পিপীলিকার রাজ্যে এমন সব দধীচির লীলা নিত্যই হয়।

এই দর্জ্জি পিঁপড়ে এসিয়া ও আফ্রিকার সমুদয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করে। এবং এদের মত সবুজ রঙের পিপীলিকা পৃথিবীতে দুর্ল্ভ। অবশ্য এদের এক একটি শাখা লাল রঙের এবং পশ্চিম আফ্রিকার এক দল কাল রঙের।

সলোমান দ্বীপপুঞ্জে এই সকল পিপীলিকা দলে দলে বাস করে। এরা সব বড় বড় গাছের মগ ডালে বাসা করে থাকতে ভালবাসে।

বিভিন্ন পিপীলিকা

প্রায় আট হাজার বিভিন্ন রকমের পিপীলিকা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন শাখার নাম পনেরাইন্‌স, এরা আদিম বর্ব্বর জাত। গুহাবাসী আদিম নরনারীর মত এরা কেবলমাত্র শীকারের দ্বারা জীবন যাপন করে। লুটপাট ও লড়াই এদের একমাত্র পেশা। এরা বড়ই দুঃসাহসী। এদের বড় বড় দাঁত আছে, তার সাহায্যে এত জোরে কামড়িয়ে ধরে যে এদের মুণ্ডু ছিঁড়ে গেলেও কামড় খোলে না। এদের হুলের তলদেশে বিষের থলি আছে। মানুষকে যদি এরা দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করে তাহলে তারও জীবন সংশয় করে তোলে। এরা সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করে। শীতপ্রধান দেশেও এদের যাতায়াত আছে।

এদের মধ্যে একটী শাখা খুব ছোট আকারের ; আবার এমন শাখাও আছে যারা সকলের চেয়ে বড় পিপীলিকার শ্রেণীভুক্ত। এই বড় জাতের পিপীলিকারা দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চিও হয়। এরা নিজেদের মধ্যেও মারামারি করে।

পিপীলিকা দৈত্য

পিপীলিকারা যদি এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চি লম্বা হয় তাহলে বড় কম হ'ল না! ধূলিকণার মত ছোট ছোট পিপীলিকার কাছে দেড় ইঞ্চি পিপীলিকা যে বিরাট দৈত্য সদৃশ, তা' তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। ঐ সব পিপীলিকা দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া ও ব্রেজিল অঞ্চলে বাস করে। এরা পনেরাইন্‌স্‌দের বৃহত্তম শাখা। এরা যখন এদের ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে দলে দলে অগ্রসর হয় তখন এরা কাউকে গ্রাহ্য করে না। এদের মধ্যে যাদের "বুলডগ" পিপীলিকা বলা হয় তারা আরও ভীষণ। এদের অষ্ট্রেলিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। এদের কামড়ের জোর দারুণ। এরা যেমন হিংস্র তেমনি শক্তিমান্।

ওয়াশিংটনের পশুশালার অধ্যক্ষ W.M.Mann সাহেব আফ্রিকার এই .পনেরাইন্. পিঁপড়েদের ভীষণ যুদ্ধ দেখে-:

"বুলডগ পিঁপড়ে"

এরা বুলডগ কুকুরের চেয়েও হিংস্র।

এদের দাড়া করাতের মত। আর হুল সিকি ইঞ্চি লম্বা। একটা কাছের পিঁপড়ের পিছন দিকে অল্প অল্প হুল দেখা যাচ্ছে। এই ভীষণ সৈনিক পিঁপড়েরা দুই জাতের এবং বড়জাতের পিঁপড়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, প্রায় কুড়ি ফিট লম্বা একটী সৈন্যদল তীব্রগতিতে কুচকাওয়াজ্ করতে করতে টারমাইট্ নামক উঁইজাতীয় পোকার রাজ্য

আক্রমণ করল। মাটীর ওপর থেকে যুদ্ধটা ঠিক বোঝা গেল। কিন্তু দু'তিন মিনিট পরে তিনি দেখ্‌লেন সেই সৈন্য দলটী মাটীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। প্রত্যেকের দাড়ায় একটী করে মৃত টারমাইট্ পোকা।

টারমাইট্‌রা পনেরাইন্‌স্‌দের প্রধান খাদ্য। অনেক সময় এরা টারমাইট্‌স্‌দের বাসায় বা তার কাছাকাছি নিজেদের বাসা গড়ে। এরাও তো বোকা নয় যে এমন জীবন্ত খাদ্য ভাণ্ডার ছেড়ে অন্য কোথাও বাস করবে! নিরীহ টারমাইট্‌রা এদের কিছু করতে পারে না।

রক্তলোভী যোদ্ধা

এই পনেরাইন্‌স্‌দের কয়েকটী দল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শিকার করে ও যুদ্ধ করে জীবন ধারণ করে। এদের ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি ও যাযাবর স্বভাব নিরীহ পিপীলিকা-দের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মানুষের মধ্যে যারা ডাকাত, চঞ্চল ও নিষ্ঠুর, তাদেরও বংশধরেরা ভবিষ্যতে সুসভ্য হয়ে, প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত ক'রে একদেশে বসবাস

সৈনিক পিপড়ের সম্মিলিত আক্রমণে বিশাল দেহ অসহায় অজগর।

করে—কিন্তু এই দস্যু পিপীলিকাদের জীবন ধারণ চিরকালের জন্য সীমাবদ্ধ। নিষ্ঠুর উত্তরাধিকারী সূত্রে ওরা যে বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুর যাযাবর স্বভাব পেয়েছে তা' তাদের এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জীবনে চিরস্থায়ী ; এর আর নড়চড় নেই।

এরা অন্ধ এবং সেজন্য এদের স্বভাব আরও নৃশংস হয়ে উঠেছে। দলে দলে যখন এই অন্ধ পিপীলিকার দলটী রণসাজে সজ্জিত হয়ে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে, তখন তাদের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। বড় বড় গর্ত্তের মধ্যে এরা ঢোকে ; প্রকাণ্ড গাছে চড়ে ; মানুষের বাড়ী পর্য্যন্ত চড়াও করে,—যদি বোঝে, ওখানে ওদের শীকার মিলবে। ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতিকে বাগে পেলে তা'দেরও কাবু করে ফেলে।

এদের পুরুষদের পাখা থাকে, রাণীদের কখনই পাখা থাকে না। রাণী কেবল চিরজীবন ধরে সন্তানের জন্ম দান করেন, এ ভিন্ন এর আর কোন কাজ নেই। কর্ম্মীরাই সৈনিক।

এই যোদ্ধা পিপীলিকাদের সকল মহাদেশেই দেখা যায়। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই এরা দলে ভারী।

আফ্রিকায় ও দক্ষিণ আমেরিকায় এই যোদ্ধা
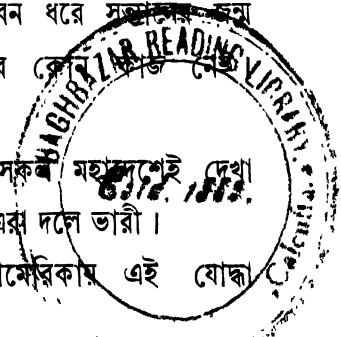
পিপীলিকাদের বড় বড় দল দেখতে পাওয়া যায়। এরা যখন দলে দলে মার্চ্চ করে যায়, বড় বড় হাতীদেরও নাকি এদের পথ ছেড়ে দিতে হয়। এরা অন্ধ, সুতরাং পশুদের চেহারা এদের কাছে কিছুই নয়।

এরা এক এক সময় নিজেরা ছোট ছোট সেতু তৈয়ারী করে। একদল তীরের গাছ পালা কামড়ে ধরে আর একদল তাদের লেজ কামড়ে ধরে, এইভাবে জলের ধারার ওপর বেশ সুন্দর সেতু তৈরী করে। এই সেতুর ওপর দিয়ে এরা সৈন্য চালনা ক'রে পরপারে শত্রুদের রাজ্য আক্রমণ করে।

উঁই পোকা

উঁই পোকাদের ঠিক পিপীলিকা জাতির মধ্যে ফেলা যায় না, ইংরাজীতে এদের "সাদা পিঁপড়ে" (white ants) বলে। কিন্তু সত্যই এরা "সাদা" নয় কিংবা পিঁপড়েও নয়। এরা বরং তেলা পোকার জ্ঞাতি।

এদের মধ্যে সৈন্য বিভাগ, কর্ম্মী বিভাগ দুইই আছে

এবং স্ত্রী ও পুরুষ দুইই আছে। পিপীলিকাদের বাসায় যেমন রাণীর প্রভুত্ব, এদের তা' নয়। এদের রাজাও রাণীও আছে। তবে এদের রাজ্য স্থাপন প্রণালী পিপীলিকাদের সঙ্গে একই রকমের। এক এক সময় আকাশ উঁই পোকায় ছেয়ে যায় ; তখন এদের ডিম পাড়ার কাল। বর্ষাকালে এক পশলা বৃষ্টির পর ঝাঁকে ঝাঁকে এই পোকাদের উড়তে দেখা যায়। তবে এদের পাখা অতি অল্পেই খসে যায়।

এই পোকারা, গাছে ও মাটীর ঢিবিতে ঠিক পিপীলিকা-দের মতই বাস করে ; কিন্তু পিপীলিকার খাদ্য এদের খাদ্য নয়, এদের খাদ্য বলতে কেবল কাঠ। এরা কাঠ চিবিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলে। এরা প্রায়ই অন্ধকারে বাস করে। বেশী উত্তাপ পেলে এদের মৃত্যু হয়।

পিপীলিকার নানাগুণ

পিপীলিকারা মানুষের মতই নিজেদের তৈরী বড় বড় সহরে বাস করে। তারা নিজেদের জাতভাইকে কেবল

গন্ধের দ্বারা চিন্‌তে পারে ;—যাদের সে গন্ধ নাই তারা তাদের শত্রু। এই ভাবেই এরা শত্রু মিত্র বুঝতে পারে।

পিপীলিকাদের স্বদেশপ্রেম অসাধারণ। নিজের বাসার জন্য, রাজ্যের জন্য, রাণীকে রক্ষা করবার জন্য, এরা নিজেদের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পরে। এরা ভীষণ পরিশ্রমী। এক মুহূর্ত্তও এরা বাজে সময় নষ্ট করে না। এদের আড্ডা মারা, বলে কোন জিনিষ পাওয়া যায় না। এরা ঘর তৈরী করে, বাসা তৈরী করে, নগর নির্ম্মাণ করে, খাদ্য সংগ্রহ করে, হিসেবী লোকের মত খাদ্য ভাঁড়ারে জমা করে রাখে এবং কি করলে খাবার বহুকাল অবিকৃত ভাবে রাখা যায় তা' জানে।

যখন এদের দল অগ্রসর হয়, মানুষ পর্য্যন্ত তখন ভয়ে পালায়। পথে এরা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যা পায় ধ্বংস করতে করতে বিজয়ীর মত অগ্রসর হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

কয়েকটী অদ্ভুত পিপীলিকা

মধুবাহী পিপীলিকা

পরীর গল্পে তোমরা হয়তো শুনেছ ডাইনী বুড়ীরা ছোট ছোট ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতো, আর তাদের আচ্ছা করে খেতে দিয়ে খুব মোটা করতো; শেষকালে এই সব মোটা ছেলেদের ধরে মজা করে তাদের নধর মাংস প্রাণ ভরে খেতো। এটা কিন্তু গল্প, কিন্তু পিপীলিকাদের মধ্যে সত্যই এই রকম জীব আছে।

একশ্রেণীর পিপীলিকার বাচ্চাদের খুব করে মধু খেতে দেওয়া হয়, তাদের পেটটী যখন মধুতে বোঝাই হয়ে জালার মত বড় হয়, তখন তাদের মাটীর নীচে নিজেদের ভাঁড়ার ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। মাসের পর মাস তারা ঘরের ছাদ কামড়ে ঝুলতে থাকে।

এরা যদি মানুষ হতো, তাহলে কি ভয়ঙ্কর হতো বলত? কিন্তু এরা তো মানুষ নয়, এরা যে মধুবাহী

পিপীলিকা! এদের আচার ব্যবহার অন্য রকম। এরা মৌমাছির মতই মধু সংগ্রহ করে এবং এই সব মধু জীবন্ত জালার মধ্যে পুঁজি করে রাখে। এই জালার মত পেট নিয়ে এই সব পিপীলিকার দল যখন ছাদ থেকে ঝুলতে থাকে, তখন তাদের সুন্দর পেটটী চক্ চক্ করে।

মানুষ হলে অনেক পয়সা খরচ করে বড় বড় জালা কিনে তার ভেতরে মধু সংগ্রহ করে রাখতো কিংবা হয় তো কলের পাত্র মাথা ঘামিয়ে তৈরী করতো,—কিন্তু মানুষ অনেক চেষ্টা করেও মধুকে অবিকৃত রাখতে পারতো না। হয় তো তা কিছুদিন পরে গেঁজে বা পচে উঠতো।

কিন্তু এদের জালা বা কলের পাত্র কিনবার জন্য পয়সা খরচ করতে হয় না; ছোট ছোট বাচ্চাদের পেটের মধ্যে ঠেসে মধু পুরে রেখে দিয়ে বছরের পর বছর অন্ধকার-ময় ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখে—আংটার সাহায্যে নয়, কিংবা কল কব্জার সাহায্যেও নয়,—শুধু তাদের জীবন্ত দাড়া দিয়ে। আর বছরের পর বছর সে মধু তাজা থাকে, একটুও নষ্ট হয় না। যখন পরিশ্রান্ত হয়ে, গরমে কাতর হয়ে কর্ম্মীরা ঘরে ঢোকে—এই সব জীবন্ত মধুর জালারা হাঁ করে খানিকটা মধু ঢেলে দেয়; কর্ম্মীরা মজা করে সেই মধু খায়।

যখন পিপীলিকার দেশে খাবার প্রচুর পাওয়া যায় তখন তারা তা থেকে কিছু কিছু এই ভাবে জমিয়ে রাখে। তুর্ভিক্ষের সময় বা কষ্টের সময় তারা এই সব মধু খেয়ে জীবনধারণ করে।

মধুবাহী পিপীলিকাদের ঘরবাড়ী

মাঠের মধ্যে বড় বড় ঘাসের বনে, বা বাঁশ বাগানে গেলে ছোট ছোট মাটীর ঢিবি দেখতে পাবে। হয় তো বা তার চার পাশে ছোট ছোট বালুকণার মত মাটী বা কাঁকর গড়িয়ে পড়ছে। হয় তো বা কোথাও দেখবে ঘাসের বনে ছোট ছোট মাটী জমে জমে বেশ বড় বড় অনেকগুলি ঢিবি তৈরী হয়ে গেছে। এই সকল ঢিবির ঠিক মাঝখানে খুব সরু গর্ত্ত ঢিবির ভেতর পর্য্যন্ত চলে গেছে।

এই সকল ঢিবির বাইরেটা দেখতে খুব সাদাসিধে। ঢিবির মুখ থেকে ভেতর দিকে লম্বালম্বি ভাবে তু পাশে গ্যালারীর মত ঘর। সুমুখের প্রধান গ্যালারীর আশে পাশে মেঝে থেকে খুব উঁচুতে নয়—ছোট ছোট

দেখতে পাওয়া যায়। এই সব কুঠুরী গুলির কোন কোনটা মধুর ঘর। এখানে পেটমোটা মধুর জালারা থাকে।

এই মধুর ঘরগুলি পিপীলিকাদের মৃত্যুকক্ষ বা যমের বাড়ী বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। এই কবরের ঘরের ছাদ থেকে যেন পাশাপাশি হাজার হাজার মধুর জালা ঝুলতে থাকে। কিন্তু এর মধ্যে মজা এই, যদি এই সকল জালার মধ্যে কেউ মারা যায়, মৃত জালাটী সেই কবরঘরে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে থাকে ;—কেউ তাতে ভুলেও হাত দেয় না।

মধুবাহীদের গৃহ দর্শন

তোমরা অনেকে আজব দেশের এ্যালিসের গল্প (Alice in wonder land) পড়েছ। এস আমরা এ্যালিসের মত খুব ছোট হয়ে এই আজব পিপীলিকাদের বাড়ী প্রবেশ করি। প্রথমে ঢিবির মুখ থেকে ঘরের যে প্রধান সিঁড়িটী নীচে নেমে গেছে, এস আমরা ওই সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকি। গেটের গোড়ায় প্রহরী পিপীলিকাদের যেন সেলাম দিতে ভুলে যেও না। ভেতরে সমস্তটা হাল্কা

অন্ধকারে ভর্ত্তি। ওপর থেকে দিনের উজ্জ্বল আলো অল্প অল্প ভেতরে আসছে। এখন বাঁ দিকে মোড় ফিরে সরু পথ বেয়ে চল। এই পথটী ক্রমে ক্রমে গভীর অন্ধকারে নেমে গেছে। পথটী কিন্তু ভারী পরিষ্কার। অনবরত চলে চলে রাস্তাটী একেবারে মেঝের মত হয়ে গেছে। রাস্তাগুলি যেমন পরিষ্কার তেমনি সোজা; অন্ধকারে এ রাস্তায় চলতে কোনই অসুবিধা নেই।

প্রায়শেই অনেকগুলি ছোট ছোট পায়ের শব্দ শুনতে পাবে। পিপীলিকারা মুখে করে মাটী বয়ে ওপরে নিয়ে যাচ্ছে—বাইরে ফেলে দেবে বলে। তারা সদর রাস্তার পাশে আর একটী ঘর খুড়চে। প্রত্যেক মাটীর টুকরোটী, প্রত্যেক আবর্জ্জনাটী বয়ে বয়ে পিপীলিকারা চলেছে বাইরে ফেলে দেবে বলে।

শুনতে পাচ্ছ? কোথা থেকে শব্দ আসছে? ঐযে পিঁপড়েটী কাজ করতে করতে হঠাৎ থেমে গেল! ঐ বলছে "হুম্-ম্-ম্" অর্থাৎ মধু খাব! "বড়ই পরিশ্রম হয়েছে! আর পারি না!" ঐ দেখ,—পাশ থেকে অন্ধকারে একটী পিঁপড়ে নেমে গেল, আস্তে আস্তে খিলেন-করা মধুর ভাঁড়ারের ঘরের দিকে।

এস চুপি চুপি আমরাও ওই খিলেন-করা গোলছাদের

ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ি। ওরে ব্যাস্, ছাদ থেকে ইলেক-ট্রিক আলোর গোল গোল অনেকগুলি বাল্বের মত বাদামী রঙের বড় বড় জালা ঝুলচে, ঘরের প্রায় অর্দ্ধেকটা জুড়ে! মধুর মধ্যে যে ক্ষীণ আলো আছে, সে আলোয় ওগুলি মাঝে মাঝে চক্চক্ করছে; তাতেই তো বোঝা যাচ্ছে, ঐ বাদামী রঙের জালাগুলি মধুতে ভর্ত্তি। ঘরময় এত গন্ধ কেন? ওযে টাট্কা মধুর গন্ধ!

সমস্ত ছাদটী জুড়ে এরা রয়েছে। পাশে পরিষ্কার দেয়াল মেঝে পর্য্যন্ত নেমে গেছে। মেঝেটী মসৃণ, যেন একেবারে বার্ণিশ করা। কিন্তু ছাদটী ইচ্ছে করেই এবড়ো-খেবড়ো করা হয়েছে। কেননা তা নইলে দাড়া দিয়ে ধরা যাবে না। এই অর্দ্ধবৃত্তাকার ঘরটী মধুর ভাণ্ডারের জন্য ইচ্ছে করে করা হয়েছে। পাছে ময়লা ধূলো ঢুকে এই সব ভাঁড়ার ঘরের ক্ষতি হয় বা জীবন্ত জালাগুলির স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়, তাই ঘরটি ঝর্ঝরে পরিষ্কার।

ঐ দেখ সেই পিঁপড়েটী মধু খেতে ভেতরে ঢুক্ল। এই ঝুলন্ত পিঁপড়েদের মতই এর চেহারা। এরও মাথাটী হল্দে, কোমরটীও হল্দে, কিন্তু এর পেটটী এদের মত ফুলো বেলুনের মত নয়। তিনি এসেই প্রায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে জালাদের দিকে উঠতে লাগলেন। একটী জালার মুখের

দিকে মুখটী হেলিয়ে তিনি সভ্যভাবে বললেন "দয়া করে মুখটী খুলবেন কি ?"

ক্ষুধার্ত্ত কর্ম্মীরা তাদের বেলুনের মত ভগ্নীদের কাছে গিয়ে হাজির হয়—এবং এদের 'সাম্প্রদায়িক' পেট থেকে মধু পান করতে আরম্ভ করে। এই অদ্ভুত উপায়ে মধু-বাহীরা মধু সংগ্রহ করে রাখে। যখন খাবারের অভাব হয়, তখন তারা এই মধু পান করে জীবন ধারণ করে।

সঙ্গে সঙ্গে চিচিংফাঁকের মত মুখটী খুলে গেল, আর পেটের ভেতর থেকে পরিষ্কার মধু মুখে এসে পৌঁছাল।

তিনি এক ফোঁটা, দুই ফোঁটা, অবশেষে তিন ফোঁটা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন; তারপর "ধন্যবাদ" ব'লে চলে

গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জালাবাহীর মুখটী বন্ধ হয়ে গেল। চলে যাবার আগে তিনি মধু খাওয়া মুখখানি মুছলেন; পেটটী মোটা করে খেয়ে ঢেকুর তুলে চলে গেলেন।

আর একজন ঢুকলেন; আর একজন,—আর একজন। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পছন্দমত জালার কাছে গিয়ে বললেন "দয়া করে মুখটী খুলুন" এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখটী খুললো এবং মধু বেরিয়ে এল।

কিন্তু ধর এরা যদি মধু নিতে না এসে, জমা দিতে আসে তা' হলে কি করে?

তখন অতি কষ্টে তাদের মধুভরা জালার মত পেটটী বয়ে ধীরে ধীরে জালাদের কাছে আসে। তাদের একজনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে "শিগ্‌গীর মুখটি খোল" মুখটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের মধু তার মুখে উজাড় করে ঢেলে দেয়।

এই মধু এত তাজা যে, তার রং সাদা হয়। যতক্ষণ না আর একবিন্দু বাকী থাকে, ততক্ষণ এর মুখ খোলা থাকে। শেষে পেটটী খালি করে আনন্দে "আঃ" শব্দ করে পিঁপড়েটী চলে যায়। আর পেটটী আরো [illegible] মস্ত বেলুনের মত করে, বেচারী পিঁপড়েটী মুখখানি কাঁচুমাচু করে ওপরদিকে মুখ করে ঝুলতে থাকে।

এ তখন জোরে নিঃশ্বাস নিতে ভয় পায়, হাত একটুও নড়ায় না, পা ছোঁড়ে না, পাছে তাদের পেটের এই নতুন বোঝা আরও গুরুতর হয়ে ওঠে! ওরা তো চায় না ওদের পেটটা বেলুনের মত ফেটে যাক্! কিংবা পেটের ভারে নীচে পড়ে যাক্!

এই পিঁপড়েদের দুটো পেট। একটা তার নিজের খাবারের জন্য; অন্যটায় জাতভাই সকলের উদরপূর্ত্তির সাহায্যের জন্য। খাবার পেটে দিলে দুটি পেটেই খাবার যায়; দ্বিতীয় পেটের খাবার জমা থাকে; প্রথম পেটের খাবার হজম হয়ে যায়। অনেক পিঁপড়েই তার সঞ্চিত খাবার খায়। কিন্তু এদের মধ্যে এক একজনের খাদ্য সঞ্চয় করে রাখবার অসাধারণ ক্ষমতা থাকে। এই হতভাগ্যরাই জীবন্ত মধুভাণ্ডারে পরিণত হয়।

মধু অন্বেষণে বিরাট নিশীথ অভিযান

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পিপীলিকাদের গৃহ-দুর্গের চারিদিক নিস্তব্ধ। গাছের ফাঁক দিয়ে ঘাসের ভেতর দিয়ে জোছনার আলো অল্প অল্প চিক্‌চিক্ করছে।

মনে হয় চারিদিকেই গভীর নিদ্রার জাল বিস্তার হচ্ছে। এই পিপীলিকার ঢিবিটি ওপর থেকে মনে হচ্ছে যেন চুপ চাপ, ভেতরে সবাই বুঝি ঘুমুচ্ছে।

কিন্তু একটীও পিপীলিকা ঘুমায় নাই। সকলেই মাটীর নীচে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। এতক্ষণ এদের দুর্গের দ্বার বন্ধ ছিল। হঠাৎ একটী একটী করে অনেকগুলি পিঁপড়ে গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এল। বোঝা গেল, দুর্গের দ্বার খোলা হয়েছে।

গর্ত্তের বাইরে এসে ঢিবির চারিদিকে এরা ঘোরাঘুরি করতে লাগল। এদের কয়েকজন গর্ত্তের মুখের গোড়ায় দাঁড়িয়ে দ্বার রক্ষা করতে লাগল। এরা সকলেই প্রহরী পিপীলিকা।

এইবার গর্ত্তের ভিতর থেকে একটি পিঁপড়ের মুখ বেরোতে দেখা গেল, যেন সঙ্গিনধারী সৈন্যের মত। তারপর আর একটী, ক্রমে ক্রমে একটী বৃহৎ সৈন্যের দল গর্ত্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে গর্ত্তের চারিধারে এসে দাঁড়াল। এরা দলে বোধহয় দু'হাজার হবে। এইবার তাদের ঘাসের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের পাহাড় ডিঙিয়ে অল্প চাঁদের আলোয় অভিযান আরম্ভ হবে।

হঠাৎ দেখা গেল সেই বৃহৎ পিপীলিকার সারটী চল্‌তে

আরম্ভ করেছে। প্রায় পনের মিনিট গাছের পাতা ডিঙ্গিয়ে কাঠের গুঁড়ির নীচে দিয়ে বৃহৎ বাহিনীটী চল্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হয়ে একদল মহুয়া গাছের পাতায় পাতায় রসের সন্ধানে ঘোরাঘুরি কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। কেউ মহুয়া ফুলের মধ্যে প্রবেশ কর্‌ল, কেউ বা গুঁড়ির গায়ে যেখান থেকে আঠা পড়্‌ছে, সেখানে প্রবেশ কর্‌ল। অবশ্য সকলেই যে কৃতকার্য্য হ'ল তা'নয়, অনেকে পাশের শালগাছে উঠ্‌ল। শালের আঠার চারিদিকে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। যে সব আঠা সবেমাত্র ঝর্‌তে আরম্ভ করেছে, সেখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে অন্য নতুন আঠার সন্ধানে গেল। আবার কিছুক্ষণ ঘুরে এসে প্রথম আঠার কাছে গেল। এইভাবে তাদের কাজ আরম্ভ হ'ল।

পিপীলিকারা যে সব গাছের রস পুরোণো হয়ে লাল হয়ে গেছে তাদের ছোঁয় না। যেসব গাছে নতুন সাদা রস বেরোয়, সেই সব রসের চারিদিকে ঘোরে; তাতে মধুর বিন্দু ঝক্ ঝক্ করে। সমস্ত রাত্রিতে প্রত্যেক গাছে এই নতুন রস তিনবার করে বেরোয়; পিপীলিকারা তা' জানে। তাই সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে সারা রাত্রিই রস সংগ্রহ করে।

ভোরের বেলায় যখন চাঁদের আলো নিভে তারার আলো ম্লান হয়ে আসে, তখন এদের কাজ শেষ হয়। তখন মধুর ভারে ক্লিষ্ট গতিতে এরা ঘরের দিকে ফেরে। অবশ্য সকলেই যে মধুতে পেট মোটা করে আসে তা' নয়। কেউ কেউ মধু পায় না।

মধু সংগ্রহ করে এরা ফিরে এলে, ভেতর থেকে একদল কর্ম্মী পিপীলিকা সিঁড়ি বেয়ে গর্ত্তের মুখে এসে হাজির হয়। তারা প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত মধুর বোঝা ভেতরে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রার্থনা করে। ক্রমে ক্রমে মুখে মুখে মধু ভেতরে চলে যায়।

একএক জন কর্ম্মীর পেটটী মস্ত বড় হয়। তাদের মুখে অনেকে ইচ্ছা করেই মধু ঢেলে দেয়। কেননা সকলেই এর ভবিষ্যৎ জানে। এ হয়তো ভবিষ্যতে মধুর জালায় পরিণত হতে পারে।

ছোট ছোট শিশু পিপীলিকাও মুখ হাঁ করে—এদের মুখেও মধু ঢেলে দেওয়া হয়, এই মধুর প্রায় সমস্তটাই তাদের সাম্প্রদায়িক পেটে গিয়ে হাজির হয় এবং পেটটী বেলুনের মত মোটা হয়।

তারপর যদি কিছু বাড়তি মধু থাকে, তা অন্ধকারময় গোলছাদওয়ালা ঘরে গিয়ে জমা হয়—যেখানে জীবন্ত মধুর জালা ঝুলচে।

মধুর জালা

এই মধুর জালাদের সম্বন্ধে তোমরা শুনেছ। এদের পেটে মধু ভর্ত্তি থাকে। কিন্তু তোমরা হয়তো বলবে, এরা চিনির বলদের মত কি কেবল মধু বয়েই বেড়ায়, —খায় না?

কিন্তু তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে, এরা মধু খায় না বল্লেই চলে। এদের খাবার ছোট পেটটী মধুর বেলুনের মত বড় পেটের চাপে পাতলা হয়ে এক পাশে কাগজের মত পড়ে থাকে।

এ দেখলে সন্দেহ হয় সত্যই এরা খাওয়া দাওয়া করে কি না।

এদের কাজ করবার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। এদের মধ্যে একদল পেছনের পা দিয়ে ছাদ আঁকড়ে ধরে মধ্যখানকার পা দিয়ে শরীর ধোয়া মোছা করে নিজেদের পরিষ্কার করে রাখে।

কিন্তু তা বলে মনে করো না, পিপীলিকারা এদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন যত্ন নেয় না।

একদল নার্স এদের জন্য রাখা হয়, তারা তাদের পা

ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। মেঝেয় ঝাঁটপাট দেয়, আর অনবরত দেখে এদের বেলুন গুলি শুক্‌নো ও

মধুর জালা

এই ভাবে মধু বহন করে সারা জীবন ধরে এই সব পিঁপড়েরা বাসার ছাদ ধরে ঝুলতে থাকে। মধু ফুরিয়ে গেলে কর্ম্মীরা গাছের আটার রস থেকে মধু নিয়ে এসে এদের মুখে ঢালে, পেটটা বেলুনের মত হয়ে যতক্ষণ না ফাট-ফাট হয়, ততক্ষণ এদের পেটে মধু বইতে হয়। এদের একমাত্র কাজ হয় মধুর জীবন্ত পাত্র হয়ে থাকা ও ক্ষুধার্ত্ত কর্ম্মীদের মধু দান করা। বেচারীরা!

স্বাস্থ্য পূর্ণ আছে কিনা। মাঝে মাঝে এদের বেলুনে মুখ দিয়ে দেখে মিষ্টি আছে কিনা।

ঋতুর পর ঋতু কেটে যায়। বছরও ঘুরে আসে। এই পেটমোটাদের মুখে যখন মধু ঢেলে দেওয়া হয়, তখন তা'রা বুঝতে পারে, বসন্ত এসেছে—শাল মহুয়ার নতুন রস তাদের পেটে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যখন তাদের পেট থেকে মধু ঢেলে নেওয়া হয়, তখন তারা জানতে পারে বাইরের জগতে শীত এসেছে, কেননা এখন শাল মহুয়ার রস পুরাণো হয়ে জমাট বেঁধে গেছে।

যখন মধুর জালাদের মৃত্যু হয়

এই মধুর জালারা চিরকাল আর বাঁচে না। ছাদ আঁকড়ে ধরে ধরে তাদের সরু সরু হাত, দাড়া, পা, ক্রমে ক্রমে অবশ হয়ে যায়। তখন তারা আর ছাদ ধরে থাকতে পারে না; নীচে শক্ত মেঝেয় পড়ে যায়। মাটীতে বিরাট পেট নিয়ে চিৎপাৎ হয়ে পড়ে গিয়ে আর শরীরকে উল্টোতে পারে না। শূন্যে হাত পা ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু চেষ্টা করে কোন ফল হয় না। এরা উঠতে পারে না।

এরা যদি এমন ভাবে পড়ে, যাতে করে আবার উঠে দাঁড়াতে পারে, তা'হলে হয় ত একটু একটু করে স্বস্থানে ফিরে যাবার চেষ্টা করতে পারে ; কিন্তু নিজে আর ছাদে উঠতে পারে না। তাদের পরিষ্কার করবার জন্য বা তাদের মধু খাবার জন্য যখন পিঁপড়েরা ঘরে ঢোকে তখন তাদের এই অবস্থায় দেখে আরও পাঁচ জনকে ডেকে নিয়ে আসে আর ঠেলে ঠেলে ছাদে পৌঁছে দেয়, যতক্ষণ না তারা আবার দাড়া দিয়ে ছাদ আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে।

কিংবা কখন কখন দাড়া ফসকে যখন কোন পিপীলিকা মাটীতে পড়ে যায় তখন তাদের পেট ফেটে যায়। মধু চারিদিকে গড়িয়ে পড়ে। পিপীলিকাটী মাটীতে শুয়ে শুয়ে দেখে তার সব মধু গড়িয়ে পড়ছে। রাজ্যের সকলে মিলে চেষ্টা করলেও আর সে মধুকে যথাস্থানে পুরে রাখতে পারে না।

অন্যান্য পিপীলিকারা তার পড়ার শব্দ শুনতে পায়। তখন তারা দৌড়ে এসে মধুর চারিদিকে ঘুরতে থাকে, আনন্দে মধু চাকতে থাকে, মুখে করে মধু নিয়ে গিয়ে অন্যান্য জালায় পুরে রাখে কিংবা বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্য মধু মুখে করে দৌড়ে চলে যায়।

কখন কখন ভাঙ্গা জালা আপনা আপনি জুড়ে যায়।

তখন তাকে আবার ছাদে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এবং পুনরায় তাতে মধু ঢালা হয়।

অবশেষে বহু বৎসর পরে এই জালার মৃত্যু হয়। তখনও এ ছাদে ঝুলতে থাকে। অন্যান্য পিপীলিকারা তা জানতেও পারে না। তারা অন্যান্য পিপীলিকার মত একেও পরিষ্কার করে।

কিন্তু একদিন হয়তো একটী পিপীলিকা এর মুখের গোড়ায় গিয়ে বলে "দয়া করে মুখটী খোল" কিন্তু এ মুখ খোলে না। মানে? যে সমাজে অনিচ্ছা বা অবাধ্যতা অজ্ঞাত, সেখানে এরকম কথা না শোনার মানে?

কয়েকটী পিপীলিকা তখন একসঙ্গে তার মুখের কাছে গিয়ে ডাক পাড়ে "খোল খোল।" এ এখন মুখ খোলা বোঁজার বাইরে। কিন্তু তখনও তার মধু অক্ষয় ভাবে সঞ্চিত দেখতে পাওয়া যায়। তারা স্পষ্ট দেখতে পায় জালায় সোনার রঙের মধু টলটল করছে। অবশেষে তারা বোঝে ব্যাপারখানা কি।

তখন অনেক পিপীলিকা একত্র হয়ে এর সৎকার আরম্ভ করে। প্রথমে দাঁত দিয়ে কামড়ে জালাটী আলাদা করে। তারপর অন্ধকার গ্যালারীর ভিতর দিয়ে দিয়ে অনেক দূরে শ্মশান ক্ষেত্রে নিয়ে যায়। তারপর তার দেহের অপর

অংশ ছাদ থেকে খসিয়ে নেওয়া হয় এবং তাকে নিস্তব্ধ শোভাযাত্রা সহকারে সেই শ্মশানে নিয়ে যায়।

মৃত্যুর পর মৃত পিপীলিকার জালা আর কেউ ছোঁয় না। পরিষ্কার মধু তখনও জমা, একটুও নষ্ট হয় না।

নিস্তব্ধ শ্মশানক্ষেত্রে ঐ মধু ক্রমে ক্রমে গাঢ় হয়ে সোণার বর্ণ হয়ে আসে। আঙুর রসের নির্য্যাসের মতই ঐ মধু খাঁটী ও মিষ্ট।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, এই মধুবাহী পিপীলিকারা সূর্য্যের আলোয় বাঁচে না। একটী বোতলে অনেকগুলি মধুবাহী রাখা হয়েছিল, তিন মিনিটের মধ্যে তারা সব মারা যায়। তারা একেবারেই নিশাচর। দিনের আলোয় বেরুতে কখনো চেষ্টা করে না। এরা চিনি বেশ ভাল বাসে। কিন্তু মৌমাছির মধু গ্রাহ্যই করে না।

এখন এই মধুবাহীদের (honey ants) উত্তর আমেরিকার কোলোরাডো, নিউ মেক্সিকো এবং ওল্ড মেক্সিকোতে পাওয়া যায়।

মেক্সিকোর লোকেরা এই মধুবাহীদের মধু সংগ্রহ করে। কিন্তু এর দ্বারা ব্যবসায় চলে না। আধ সের মধু পেতে গেলে হাজার মধুর জালা ভাঙ্গতে হয়।

এই মধু সংগ্রহ ব্যাপার ভিন্ন মধুবাহীরা আচার ব্যবহারে

অন্যান্য পিপীলিকার মত। রাণীকে অন্যান্য কর্ম্মীরা ঘিরে থাকে। তাকে খাওয়ায় এবং যত্ন করে। সে যখন ডিম পাড়ে, সেই ডিম চেটে তারা গরম রাখে। যখন এই ডিমের থেকে বাচ্চা হয়, তখন অন্যান্য নার্সরা তাকে ধুইয়ে মুছিয়ে দেয়—মুখে মুখে খাবার খাইয়ে দেয়। নাওয়াতে হলে তাকে কোলে করে চাটতে আরম্ভ করে। তাদের অনবরত উল্টে পাল্টে দেখে তারা গরম আছে কি না।

"পিপীলিকা গরু"

পিপীলিকারা যে 'গরু' পোষে এ তোমরা আগেই শুনেছ। পিপীলিকাদের এই 'গরু'রা ঠিক আমাদের শিংওয়ালা গরুর মত নয়; কিংবা আমাদের গরুর মত তাদের বাঁট থাকে না।

এই "গরুরা"—এক জাতের পোকা। পিপীলিকারা এই সব 'গরুদের পোষ মানায় এবং নিজেদের কাজে লাগায়।

পিপীলিকারা শরৎকালে এই সব 'গরু'দের ডিম সংগ্রহ করে সমস্ত শীতকালটা নিজেদের বাসায় তাদের রেখে দেয় এবং নিজেদের ডিমের মতই তাদের যত্ন করে। বসন্তকাল এলে যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়, তখন তাদের 'চরবার' জন্য গাছের ফোঁকরে, পাতায় এবং গাছের ডালে ডালে তাদের ছেড়ে দেয়।

আমেরিকার একরকম পিপীলিকা এই সব পোকাদের গমের ক্ষেতে ছেড়ে দেয়। তারা গমের রস শুষে নিয়ে গমের খুব ক্ষতি করে।

পিপীলিকারা মাটির নীচে এদের জন্য আলাদা রকমের ঘর তৈরী করে রাখে; যখন 'গরুরা' চরে ফিরে আসে, তখন তাদের সেখানে রেখে দেয়। অনেক পিপীলিকা আবার অন্যরকম ভাবে এদের বাসা তৈরী করে। যখন এরা গাছে চ'ড়ে গাছের রস শুষতে থাকে তখন তার ওপরে ছাদ তৈরী করে দেয়।

অনেক সময় দেখবে গাছের পাতা দুমড়ে গেছে এবং তার ওপরে খুব ঘন মাকড়সার জালের মত জাল বোনা রয়েছে। ওই জাল ছিড়ে ফেল্লে ছোট ছোট পোকা বেরিয়ে পড়ে। এই পোকাগুলোই হচ্ছে 'গরু'। অনেক সময়ে খুব ছোট ছোট গাছে যখন এই ভাবে গরুর জন্য

ছাদ তৈরী করা হয়, তখন প্রায়ই তার সঙ্গে যোগ করে এই পিপীলিকারা বাসা পর্য্যন্ত ঢাকা রাস্তা তৈরী করে। আর এমন ভাবে সেখানে দোর তৈরী করে যে, ছোট ছোট

একটী পিঁপড়ে 'গরু' চরাচ্ছে
[এই ফটোটী অনেকগুণ বড় করে নেওয়া হয়েছে]

গরুরা বেরুতে পারে না,—কিন্তু পিপীলিকারা স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে।

এই সব গরুর গয়লারা মাথার লম্বা লম্বা শুঁয়ো দিয়ে তাদের শরীরে আঘাত করে। এর নাম হচ্ছে "দুধ

দোহা।” শরীরে এই ভাবে সুড়সুড়ি দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা শরীর থেকে একরকম রস বাহির করে, এই রসই হচ্ছে “দুধ”। পিপীলিকারা খুব মজা করে সেই দুধ খায়। এরকম ভাবে সুড়সুড়ি না দিলে কিন্তু দুধ বেরোয় না।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন সাহেব একবার এই গরুদের দুধ বার করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একটী চুল দিয়ে এদের পিঠে আস্তে আস্তে শুড়শুড়ি দিয়েছিলেন; কিন্তু দুধ বেরোয় নি। কি করে পিপীলিকারা যে দুধ বার করে, তা' এখনো আমরা জানতে পারি নি।

যখন এই পিপীলিকা গরুদের চিরকালের জন্য মাটীর নীচে ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়, তখন তাদের গায়ের রং হয়ে যায় বরফের মত সাদা। শরীরে আলো না পেলে এই রকম রঙের হয়ে যায়।

আরো মজা হচ্ছে এই, এই পিপীলিকাদের গয়লারা এদের দেখাশুনো করবার জন্য এদের সঙ্গেই চিরকাল ধরে মাটীর নীচে বাস করতে বাধ্য হয়; সুতরাং তারও গায়ের রং পাৎলা হল্‌দে রঙের হয়ে যায়, এবং তাদের চোখ খুব ছোট ছোট হয়ে যায়; তাতে বলতে গেলে দৃষ্টিশক্তি একেবারে থাকে না।

এদের মধ্যে পশুপালন দিক্‌টা খুবই উন্নত হয়েছে। এরা দেখলে যে, এই সব পোকারা যে রস শুষে নেয়, তার খুব সামান্য অংশ এরা কাজে লাগায়; কিন্তু বাদ বাকীটা কোন কাজে লাগায় না। যে রসটা এরা ফেলে, সে রসটা এরা চেটে দেখলে খুব মিষ্টি। তখন থেকে এদের খেয়াল হ'ল, এই সব পোকার রস কি করে নিজেদের ব্যবহারে লাগায়। এরা কিছু দিন ধরে দেখতে লাগল, কি করে পোকারা নিজেদের বাড়তি রস ফেলে দেয়। দেখে দেখে এরা মাথা ঘামিয়ে বার করলে যে, এদের গায়ে কিছু দিয়ে আস্তে আস্তে শুড়শুড়ি দিলেই এই রস দিব্যি বেরিয়ে আসতে পারে। তখন তারা মাথার শুঁয়ো দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে রস বেরোয় কিনা। যখন দেখলে রস বেশ বেরিয়ে আসে, তখন তাদের পুষতে লাগল।

"মালী" পিঁপড়ে

পিঁপড়েদের মধ্যে মালী আছে। তারা পাতা কেটে নিয়ে আসে। এজন্য এদের তোমরা "পাতাকাটা" ("খোলাকাটা" বামুনের মত) পিঁপড়েও বলতে পার। এরা আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করে।

নতুন সন্তানদের আবির্ভাবে উত্তেজিত পিপীলিকা

একটা নতুন পিপীলিকা বংশের আবির্ভাব। (a) নতুন কর্ম্মীর দলের জন্ম হইল। (b) ভবিষ্যৎরাণীর গুটিকা। ছোট ছোট গুটিকা গুলি হইতে কর্ম্মীর আবির্ভাব হইবে। এই পিপীলিকারা "গরু" পোষে।

পল্লী অঞ্চলে এরা দলে দলে দলে পাতা কেটে নিয়ে আসছে দেখতে পাওয়া যায়। রাত্রিবেলায় বা মেঘলা দিনে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, একটী প্রকাণ্ড মালীর দল গাছের পাতা কেটে মাথায় করে বয়ে নিয়ে আসছে, আর একদল পাতা কাটতে চলেছে। তখন এদের দেখলে মনে হয় যেন,জয় পতাকা নিয়ে একটী বৃহৎ সৈন্যের দল চলেছে। এক একটী পাতা এত বড় যে পিঁপড়েদের ঢেকে ফেলে দেয়। দূর থেকে মনে হয় যেন পাতাগুলো হেঁটে হেঁটে চলেছে। কিম্বা ছাতি মাথায় দিয়ে ছোট ছোট বামনদের বিরাট অভিযান চলেছে। এই জন্য এদের 'ছাতা পিঁপড়ে'ও বলে।

এদের দাড়া ভয়ানক শক্ত এবং ভারি ধারাল। যে গাছের পাতা কাটতে আরম্ভ করে। সে গাছটীকে একেবারে নির্ম্মূল করে ছেড়ে দেয়। এরা আবার মাঝে মাঝে অনেক রাস্তা পর্য্যন্ত পাতা বয়ে নিয়ে যায়। মাটীতে পাতা ফেলে দিয়ে আবার পাতা কাটতে যায়। বাসা থেকে আর একদল কর্ম্মী বেরিয়ে এসে ঘাড়ে ক'রে সেই পাতাগুলো বয়ে নিয়ে বাসায় চলে যায়।

ব্রেজিল দেশের এই মালী পিঁপড়ের এক একটী ঢিবি যেন ছোট ছোট পাহাড়ের মত হয়। তাতে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ পিঁপড়ে বাস করে।

এদের কর্ম্মীর দলটী নানারকম আকারের—মাথা মোটা সৈন্যের দল থেকে আরম্ভ করে, প্রকাণ্ড, মাঝারি ও ছোট কর্ম্মীর দল পর্য্যন্ত সকল রকমের পিঁপড়েই আছে। মাথা-

"ছুঁতোর পিঁপড়ে"

এরা ঘর দোর, পোল, গাছ ফুটো করে নষ্ট করে দেয়। উঁই পোকাদের মত এরা কাঠের পোলে বড় বড় গর্ত্ত করে; কড়ি বরগায় ফুটো করে নষ্ট করে দেয়।

মোটারা সৈন্যের কাজ করে, মাঝারি ও ছোটরা কর্ম্মীদের পাহারা দেয়, তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয় এবং দরকার হলে পুলিসের মত গুঁতো দেয়। আর এই সব কর্ম্মীদের ওপরই পাতা কাটবার ভার।

পাতা কেটে বাসায় নিয়ে এসে কি করা হয় জান ? এরা অবশ্য পাতা দিয়ে চাল বাঁধে না, বা পাতা পেতে নেমন্তন্ন খায় না অথবা গরুর মত পাতা চিবিয়ে খায় না। এরা পাতা টুকরো টুকরো করে কেটে বড় বড় ঘরের মেঝের উপর বিছিয়ে দেয়। অবশ্য বিছিয়ে দেবার আগে খুব ছোট ছোট কর্ম্মীরা মেঝে খুঁড়তে আরম্ভ করে। মেঝে খোঁড়া শেষ হ'লে পর তার উপর পুরু করে পাতার টুকরো-গুলোকে পাতা হয়। এই সব পাতা পচে তার ওপর ছোট ছোট ব্যাঙের ছাতা গজায়। সারি সারি ব্যাঙের ছাতায় মেঝে একেবারে ভরে ওঠে।

এই সব ব্যাঙের ছাতাকে যত্ন করে ছোট ছোট কর্ম্মীরা। কিন্তু কি ভাবে যে এরা এর ওপর কাজ করে আমরা তা বলতে পারি না ; কেন না এদের অদ্ভুত চাষের ফলে কপির মত ছোট ছোট ব্যাঙের ছাতায় চারিদিক ভর্ত্তি হয়ে যায়।

এই সব কপির মত মাথাগুলি কেটে নিয়ে এরা নিজেদের খাবার তৈরী করে, নিজেরাও খায় আর ছোট ছোট বাচ্চাদেরও খাওয়ায়।

পিঁপড়েরা তাদের ব্যাঙের ছাতা সম্বন্ধে খুব যত্ন নেয়। যাতে 'ক্ষেতে' আলো বাতাস আসতে পারে, তার জন্য

ওরা টিবির ওপরে অনেক ফুটো রাখে। এই ফুটো দিয়ে নীচে ব্যাঙের ছাতার ঘরে আলোও আসে, বাতাসও আসে।

এরা ভিজে পাতা ঘরে নিয়ে আসে না। সেগুলো দোরের গোড়ায় ফেলে রেখে দেয়; রৌদ্রে সেগুলো শুকিয়ে গেলে ঘরের ভেতর নিয়ে যায়।

এই মালী পিঁপড়েদের মধ্যে অনেক জাত আছে। এদের প্রত্যেক জাতটী আলাদা রকমের ব্যাঙের ছাতা তৈরী করে। এবং সে জাতের পিঁপড়েরা যে রকম ব্যাঙের ছাতা তৈরী করে, তা ছাড়া অন্য রকম কিছু হলেই উপড়ে ফেলে দেয়। ব্যাঙের ছাতার মাথাটী এদের নিজের তৈরী। কেননা যখন পরীক্ষাগারে এদের তৈরী করা হয় তখন মাথাটী গজায় না।

এরা মাটীতে সার দেয়। বোধহয় নিজেদের মলমূত্র মাটিতে ফেলে। অনেকে শুঁয়োপোকার বা গুবরে পোকার "গোবর" পাতার বদলে ব্যবহার করে। তার ওপর ব্যাঙের ছাতা গজায়। অনেকে আবার ছাদ থেকে মাটির দিকে ঝুলন্ত ব্যাঙের ছাতা তৈরী করে।

এদের রাণীরা এক বাসা থেকে আর এক বাসায় ব্যাঙের ছাতা মুখে করে নিয়ে যায়। প্রত্যেক পিঁপড়েরই

মুখের ঠিক সুমুখে পকেটের মত চামড়ার থলি আছে। খাবার চিবিয়ে চিবিয়ে সেখানে রেখে দেয়। থলির মধ্যে খাবারের টুক্‌রো গুলি লালার দ্বারা যখন গলে গিয়ে ফুলে
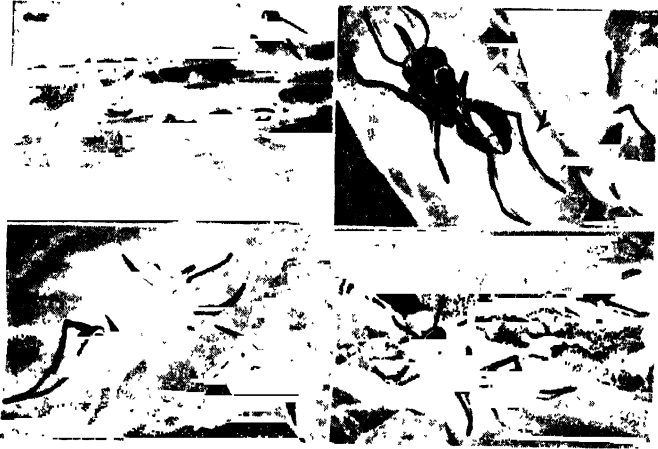
শিংওয়ালা ও দাড়ীওয়ালা পিঁপড়ে

এদের দক্ষিণ আমেরিকায় টেক্সাস্ দেশে দেখা যায়। বাঁ দিকের তলাকার পিঁপড়েদের শিং দেখতে পাচ্ছ? ডানদিকের তলাকার পিঁপড়ের দাড়ী দেখা যাচ্ছে। বাসা তৈরী করবার সময় এরা দাড়ীতে করে বালি বয়ে নিয়ে আসে।

ওঠে, তখন তাকে বার করে দেয়। বাচ্চাদের সেই তরল খাবার খাওয়ায়। নিজেরাও তরল ভিন্ন খাবার খেতে পারে না।

তৃতীয় খণ্ড

যুদ্ধ বিগ্রহ ও দাসত্ব

যুদ্ধ বিগ্রহের কথা মানুষের সমাজেই বেশী শোনা যায়। অন্যান্য জন্তুরা খাবারের জন্য একা একা কামড়াকামড়ি ও মারামারি করে; কখনো দলবদ্ধ হয়ে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে অপরকে আক্রমণ করে না। হাতীরা দলে দলে চরে বেড়ায় কিন্তু লুটপাট করবার উদ্দেশ্য নিয়ে কখনো বুনো ঘোড়ার দলকে আক্রমণ করে না। আর লুটপাটই বা করবে কি! কিন্তু আক্রান্ত হলে এরা অনেক সময় দলবদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে।

কিন্তু মানুষ ভিন্ন একটী মাত্র প্রাণী যুদ্ধ বিগ্রহ করে। এই প্রাণীরা হচ্ছে পিপীলিকা। এদের যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু আগেই পড়েছ। এবারে বিস্তারিত ভাবে ওদের যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

এরা ঠিক মানুষের মতই দলবদ্ধ হয়ে অপরের বাসা আক্রমণ করে' যা কিছু সম্পত্তি পায় লুটপাট করে নিয়ে আসে। এদের এক একটী দল প্রায় ২০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা ও ৬।৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চওড়া হয়। এদের "মার্চ্চ"

প্রায় একঘন্টা ব্যাপী হয় ও প্রতি মিনিটে এরা এক গজ বা তার কিছু বেশী অগ্রসর হয়। দলপতি আগ্রহ সহকারে মাটী শুঁকতে শুঁকতে অগ্রসর হয়; এরা মাটী শুঁকে বুঝতে পারে দাসশ্রেণী পিপীলিকাদের বাসা কোথায়। বাসার সন্ধান পেলে তীরের মত সদলে গিয়ে বাসা আক্রমণ করে। দাসেদের মধ্যে কেউ কেউ উড়ে পালাতে আরম্ভ করে আর একদল ভীষণভাবে আত্মরক্ষা করে। কেউ কেউ যতগুলি পারে বাচ্চাদের গুটিকা মুখে করে নিয়ে পালাতে থাকে। আক্রমণকারীরা বাচ্চাদের ডিম ও গুটিকা মুখে করে নিয়ে বিজয় গর্ব্বে প্রস্থান করে। আমেজান পিঁপড়েদের যুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে দাস পিঁপড়েদের বাচ্চা সংগ্রহ করা, কেননা এই বাচ্চারাই বড় হয়ে আমেজানদের খাদ্যসংগ্রহ করে এনে দেবে, রাণীর সন্তানদের পালন করবে এবং পরে আমেজানদের সঙ্গে মিশে নিজেদের জ্ঞাতি দাসদের বাসা আক্রমণ করে তাদের ডিম মুখে করে নিয়ে এসে প্রভুর বাসার দল বৃদ্ধি করবে।

এইজন্য পিঁপড়েদের বাচ্চা এদের কাছে এত দামী। এরাই হচ্ছে এদের সম্পত্তি।

যুদ্ধ করার জন্য এরা যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিল, শুঁকে শুঁকে সেই রাস্তা দিয়েই নিজেদের বাসায় ফিরে আসে।

পাতালপুরের দিগ্বিজয়ী

পিপীলিকা সম্বন্ধে কোরেল সাহেব অনেক লিখে গেছেন। তিনি একবার একটী পিপীলিকা সৈন্যদলকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার পথ হারাতে দেখেছিলেন। অনেকক্ষণ চলার পর দলটী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, অনেকে আর এগোতে চাইছিল না। যারা এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সব নেতারা মাথার শুঁয়ো দিয়ে পরিশ্রান্ত ও নিরাশ সৈন্যদের পিঠ চাপড়াতে লাগল; তখন আবার সকলে উৎসাহে এগোতে লাগল। যারা পিছিয়ে পড়ছিল তাদের একত্র করবার জন্য দলটী মাঝে মাঝে থেমে পড়ছিল।

কখন কখন পিপীলিকারা একই বাসাকে দিনের পর দিন আক্রমণ করে। যতক্ষণ না লুটপাট করবার শেষ জিনিষটী পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আক্রমণ চলে।

আর একবার কোরেল সাহেব দেখেছিলেন ফর্ম্মিকা পিঁপড়েদের বাসা আক্রান্ত হতে। একদল ফর্ম্মিকা খুব তেজের সঙ্গে বাসা রক্ষা করতে লাগল আর একদল তাদের বাচ্চাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেল, তার ফলে আমেজানরা যুদ্ধ ছেড়ে দিল এবং পিছু হট্‌তে লাগ্‌ল। ফর্ম্মিকারা রেগে দলে দলে তাদের পিছু পিছু আক্রমণ করে তাদের এত ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল যে, শেষে যে

ক'টা বাচ্চা আমেজানরা মুখে করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের ফেলে দিয়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়ে পালাল।

দস্যু পিঁপড়ের সঙ্গে দস্যু পিঁপড়েরও যুদ্ধ হয়; এবং এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর রক্তপাত হয়। পাশাপাশি রাজ্যের পিঁপড়েদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলে। মগ্রিজ সাহেব একবার এমন একটী যুদ্ধ দেখেছিলেন। এই যুদ্ধ ৪৬ দিন চলে ছিল। ফিলাডেলফিয়ায় ম্যাক্‌কুক সাহেব আর একটী যুদ্ধ দেখেছিলেন, সেটা প্রায় তিন সপ্তাহ চলেছিল।

যুদ্ধের প্রায় সাধারণ কারণ পুরাণ বাসার কাছে নতুন বাসা পত্তনের চেষ্টা। খাদ্যের অভাবও যুদ্ধের কারণ হয়। হয়ত দেখা যাচ্ছে, দুইটি জাত বেশ শান্তির সঙ্গে পাশাপাশি বাস করছে, কিন্তু হঠাৎ গরমকালে চারিদিকে খাবারের অভাব পড়লো, অমনি একটি দল আর এক দলের বাসা আক্রমণ করল।

এক দল পিঁপড়ে ঠিক চোর ডাকাতের মত গুণ্ডামি করে খায়। তারা পথের ধারে ঘাসের পাশে চুপ করে বসে থাকে। সারাদিন খেটে খুটে কর্ম্মী পিঁপড়েরা যখন খাবার মুখে করে বাসার পথে ফিরে আসতে থাকে, তখন তাদের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাদের মুখের থেকে খাবার কেড়ে নেয়।

কখনো কখনো দুর্ব্বল পিঁপড়েরা বলবানদের বাসার কাছে বাস করে। দেখলে মনে হয় তাদের সাহায্য নেবার জন্যে ও বিপদ থেকে তাদের সাহায্যে উদ্ধার পাবার জন্যে দুর্ব্বল পিঁপড়েদের এই চেষ্টা। অবশ্য এর মধ্যে সত্য যে নেই তা' নয়, তবে আসল কথা হচ্ছে, এরা বড়দের কাজ করে দেয়, তাদের বাচ্চাদের অনেক সময় দেখা শুনো করে; তার পরিবর্ত্তে বড়রা তাদের খাবার দেয়।

এই রকম চাকরগিরি ক'রে অনেক পিঁপড়ে তাদের আহারের সংস্থান করে।

এক রকম ছোট পিঁপড়ে আছে, তারা মার্ম্মিকাদের বাসার কাছে বাস করে। তারা মার্ম্মিকাদের সেবা শুশ্রূষা ক'রে তাদের কাছ থেকে খাবার পায়। তারা করে কি, মার্ম্মিকাদের ঘাড়ে উঠে তাদের গা চেটে দেয়, বিশেষতঃ মুখটি বিশেষ করে পরিষ্কার করে দেয়। এই রকম আরাম ও শুড়শুড়ি খেয়ে মার্ম্মিকাদের ভারী আনন্দ হয়। তারা এই সব অনুগতদের খাবার দেয়। মার্ম্মিকারা এই সব পিঁপড়েদের অন্যান্য আগাছা পিঁপড়ে বা পোকাদের বাসায় নিয়ে এসে পোষে।

এদের রাণী আকাশে উড়ে ডিম পাড়ার সময় এই জাতের কোন বাসায় গিয়ে উড়ে পড়ে। নিজে আর বড় বাসা

গড়ে তুলতে পারে না, তাই এদের বাসার দরকার হয়। ফর্ম্মিটা ফস্ করে বাসায় গিয়ে তাদের অনেকগুলি ছোট ছোট গুটিকা সংগ্রহ করে এবং যে সকল কর্ম্মীরা তাদের
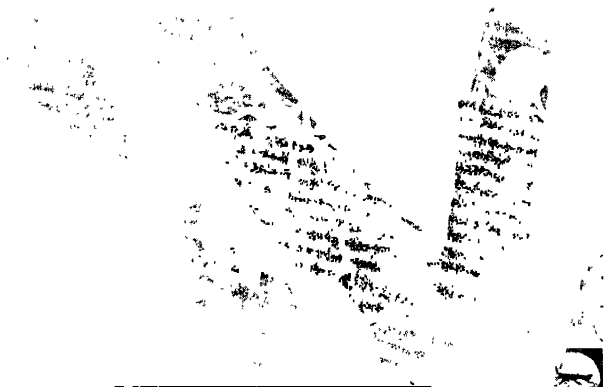
কুড়ে পিঁপড়ে

এই পিঁপড়েদের দেখতে বেশ। রোগা রোগা চেহারা, ভারী নিরীহ। এরা ছোট ছোট পোকা মাকড় ও গাছের রস খেয়ে থাকে। এরা অন্যান্য পিঁপড়েদের মত অত ব্যস্তবাগীশ নয়। ধীরে সুস্থে কাজ করে। এরা অনেক সময় পিছনের অংশটি সুমুখের দিকে নিয়ে এসে উল্টে চলে।

গুটিকা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে তাদের খুন করে। ক্রমে ক্রমে গুটিকা থেকে বাচ্চারা বেরোয়। ইত্যবসরে এই দস্যু রাণী গায়ে উপযুক্ত গন্ধ লাগিয়ে নেয়। সেই গন্ধ

শুঁকে তারা তাকে খাওয়ায় এবং তার নিজের ডিম থেকে যে সব বাচ্চা বেরোয় তাদের যত্ন করে। এই ভাবে দস্যু রাণী নিজের বাসা সৃষ্টি করে।

আর এক শ্রেণীর নিষ্ঠুর পিঁপড়ে

আর এক শ্রেণীর পিঁপড়ে আছে যারা হিংস্র ফর্ম্মিকাদের মত নিষ্ঠুর। এদের নাম পলিআর্গাস। তারা এদেরই জ্ঞাতি। এই শ্রেণীর পিঁপড়েদের রাণীর প্রকৃতি ভীষণ! এরা ফাসকাদের বাসায় ঢুকে রাণীর মাথা চোয়ালের ভীষণ ধারাল দাড়া দিয়ে কেটে ফেলে। এদের দাড়া ঠিক এই নিষ্ঠুর কাজ করবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। তারপর তার কর্ম্মীর দল বাসাটী ঘিরে ফেলে। এই কর্ম্মীরাও ঠিক তাদের রাণীর মত! এরা কখনো সকালে বা রাত্রে আক্রমণ করে না; ঠিক দুপুর বেলা শেষ হলে পর এদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। এদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই এরা ধারাল দাঁত দিয়ে বিপক্ষদের মাথা কেটে দেয়। এই জন্য স্বাভাবিক প্রকৃতি বশতই হোক বা ভীরুতা বশতই হোক

পলিআর্গাস্দের আক্রমণ আরম্ভ হলেই ফাসকারা তাদের বাচ্চাদের শত্রুর হাতে ফেলে পালাতে আরম্ভ করে। পলিআর্গাস্রা কেবল যুদ্ধ করতেই জানে; সন্তান পালন বা খাদ্য সংগ্রহ করতে জানে না। তাই তাদের দাস সংগ্রহের প্রয়োজন হয়।

হুবার সাহেব এই পিঁপড়েদের নিয়ে একবার একটী পরীক্ষা করে ছিলেন। তিনি একটী বোতলের মধ্যে প্রায় ৩০।৪০টী পলিআর্গাস্, তাদের ছোট ছোট বাচ্চা ও অনেক খাবার পুরে রেখেছিলেন। কিন্তু একটীও দাস রাখেন নি। দু' একদিন পরে দেখলেন, অনেকগুলি পিঁপড়ে ক্ষুধায় মারা গেছে, কিন্তু কেউই খাবার চেষ্টাও করে নি। তারপর একটীমাত্র দাস তার ভেতর ছেড়ে দেওয়া হল। তক্ষুণি সে তাদের বড়দের খাবার খেতে দিল, বাচ্চাদের সেবা যত্ন করতে লাগল এবং বাসা তৈরী করবার জন্য মালমসলা খুঁজতে লাগ্ল।

এই পিঁপড়েদের একটা মজা এই, যখন বাসা বদলান আরম্ভ হয়, তখন এদের দাসরা প্রভুদের ঘাড়ে করে এক বাসা থেকে অন্য বাসায় নিয়ে যায়। হিংস্র ফর্ম্মিকারা কিন্তু নিজেদের দাসদের বয়ে নিয়ে যায়।

অতিথি ও পরগাছা পিঁপড়ে

পিঁপড়েদের সামাজিক জীবন ঠিক মানুষের মত নয়। সাধারণ মানুষের বাড়ীতে মাঝে মাঝে দেখা যায় অতিথ-কুটুম আসছে যাচ্ছে। মানুষ বাড়ীতে সখ করে গরু পোষে, কুকুর পোষে, পাখী পোষে। তার বাড়ীতে বেড়াল, ইঁদুর, ছুঁচো বাস করে। বেজী, ভাম, শেয়াল এসে উৎপাত করে। পায়রা এসে বাসা করে। বিছানায় মাদুরে, মশারিতে ছারপোকা বাসা করে। ঘরের কোণে অন্ধকার জায়গায় মশা এসে কায়েম মোকাম করে বসে থাকে। পিঁপড়ে, উঁই, আরশুলা এসে বিনা আপত্তিতে তার বাড়ী ঘর দোর খাবারে ভাগ বসায়। জীব জগতের কতরকম পোকা মাকড় যে তার আশ্রয় পেয়ে বেঁচে যায় তার ঠিকানা নেই। এই সব জীবজন্তু আমাদের নিত্যসঙ্গী বলতে পারো। কিন্তু পিঁপড়েদের রাজ্যে যাদের অতিথি বলা যায় এরা ঠিক তা নয়। মানুষ শুধু সখ করে গরু পোষে না, পিঁপড়েও নিজের গরু ঠিক সখ করে পোষে না। কিন্তু গরু বা কুকুর ছাড়া আর যে সব অতিথি তার বাড়ীতে

বাস করে, মানুষ তার জন্য আনন্দ প্রকাশ করে না—বরং তাদের উৎপাত দেখে বিরক্তই হয়।

পিঁপড়েদের একমাত্র "গরু" ছাড়া আর কোন গৃহ-পালিত পশু নেই। কিন্তু খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাদের মধ্যে একরকম পোকা বাস করে, যাদের ঠিক পিঁপড়ে বলা চলে না, এবং যাদের দ্বারা পিঁপড়েদের কোন উপকারও হয় না। এদের পিঁপড়েদের অতিথি বা 'পরগাছা' বলা হয়। পিঁপড়েদের রুচি বা ইচ্ছা অনুসারে এই সব পোকাদের জন্ম হয়।

যে সব বিজাতীয় অতিথি এদের বাড়ীতে এসে বাস করে, তাদের চেহারা আর এদের চেহারা লম্বায় চওড়ায় বা আকার প্রকারে প্রায় একই ধরণের। যদি কল্পনা করা যায়, আমাদের বাড়ীতে যে সব জীব বাস করে তাদের কোন উপায়ে বড় করা যায়—যেমন ধর ছারপোকাগুলো যদি বাঘের মত বড় হয়, মাছি যদি মুরগী বা হাঁসের মত বড় হয়, আর টিকটিকি—যাদের দেখলে আমাদের কিছুই ভয় হয় না—তারা যদি রাতারাতি এক একটা কুমীরের মত বড় হয়ে উঠে—আর আগেকার মতই নির্ব্বিবাদে আমাদের ঘর-দোরে আধিপত্য বিস্তার ক'রে বাস করে, তাহলে কি হয়? যে সব বিড়াল মিউ মিউ ক'রে আমাদের কাছে

খাবার চায়—আর রাতের বেলায় বিছানায় এসে শুয়ে থাকে তারা যদি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত বড় হয়ে উঠে? ভাবলেও ভয় করে!

পিঁপড়েদের বাড়ীর অতিথিরা ঠিক এই রকমের। এর থেকেই পিঁপড়েদের আগাছা জাতীয় জীবদের কিছু

বাইবেলের সেই মিতব্যয়ী পিপড়ে, যাকে লক্ষ্য করে—রাজা সলোমন বলেছিলেন—"হে অলস, পিঁপড়ের কাছে গিয়ে তার আচার ব্যবহার শেখো, তা হলে জ্ঞানী হবে।"
এই পিঁপড়েটী একটী ভুট্টার দানা সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে।

কিছু পরিচয় পাবে। অবশ্য পিঁপড়েরা ঠিক যে শুধু শুধু এদের পোষে, তা নয়। এদের গ্রন্থি থেকে একরকম রস বেরোয়, সেই রসের পিঁপড়েরা বড় ভক্ত। ঠিক খেজুর রসের মত এদের কাছে তা মুখরোচক। তার দ্বারা

তাদের শরীর পোষণের যে খুব সুবিধা হয়, তা' নয়। তবে ঐ রস তাদের নেশার খোরাক দেয়। এই নেশার খোরাকের পরিবর্ত্তে এরা নিজেদের ছোট শিশুর মত এদের খাবার দেয়। এক এক সময় এই রস এদের কাছে এত মুখরোচক হয়ে পড়ে যে, তারা এই রস খাবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে এবং এই নেশায় নিজেদের ছোট ছোট শিশুদেরও পালন করতে ভুলে যায়।

হুইলার সাহেব চমৎকার ভাবে এই ভাবটী বর্ণনা করেছেন—"যে কোন কীট এই গ্রন্থি রসের অধিকারী, সেই অনায়াসে পিঁপড়েদের সেই রসের দিকে আকর্ষণ করতে পারে। তার ফলে তাকে তারা যত্ন করে খাওয়ায়, বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনের মত পোষে; ঠিক যেমন বিদেশী লোক তার ভাল ব্যবহারের ফলে অন্য দেশে সেই দেশের লোকের মত হয়ে যায়। কিন্তু পিঁপড়েদের দেশে বিদেশী বলতে মানুষের সমাজের বিদেশীর মত নয়, জীব হিসাবে তারা সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের দেশে বিদেশীরা তো মানুষ! আমরা যদি আজব দেশের এ্যালিসের মত ছোট হয়ে পিঁপড়েদের রাজ্যে ঢুকতে পারি এবং ঠিক ওই সব কীটদের মত ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমাদের সঙ্গে ওরা ঠিক ওই সব কীটদের মতই ব্যবহার করবে। আমরা

যদি গলদা চিংড়ীকে আমাদের খাবারের টেবিলে বসাই এবং তাকে সাধ্য সাধনা করে সব খাবার খাওয়াই, তার
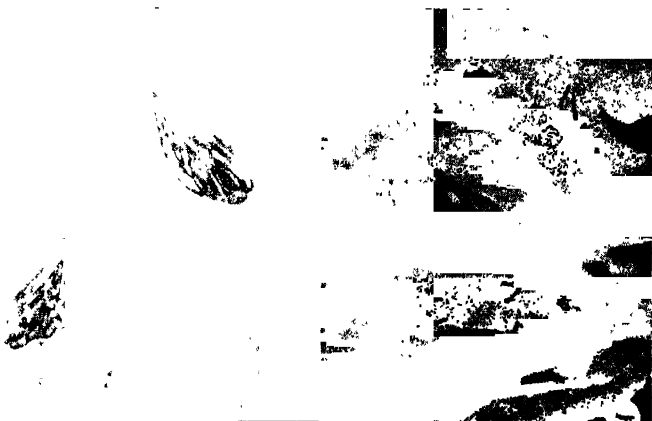
এদের অদ্ভুত মুখখানি দরজার কাজ করে। বাঁদিকের ছবিটা ভাল করে দেখ। এদের মুখ খানা কি অদ্ভুত দেখেছ। এই মুখ দিয়ে এরা বাসার মুখ বন্ধ করে বসে থাকে। যখন অন্য পিঁপড়ে এসে এদের মুখে শুঁয়ো দিয়ে বার বার আঘাত করতে থাকে তখন সঙ্কেত বুঝে এরা দোর খুলে দেয়। ছবিতে দেখ একটী পিঁপড়ে মুখ দিয়ে বাসার দোর বন্ধ করে আছে। ডান-দিকের ছবিতে অনেকগুলি পিঁপড়ে দেখা যাচ্ছে, ওরা হচ্ছে—আদিম মান্ধাতা আমলের পিঁপড়ে—চির অন্ধ।

ফলে আমাদের শিশুরা যদি মারা যায় বা খুব রুগ্ন হয়ে পড়ে, তা হলে যে অবস্থা হয়—এদের অতিথিদের প্রতিও

ঠিক সেই ব্যবহার করে' এদের অবস্থাও অনেকটা এই রকম হয়।"

এ পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০ জাতীয় অতিথির কথা জানা যায়। এর মধ্যে মাকড়সা ও চিংড়ী জাতীয় শক্ত খোলার প্রাণীরও নাম পাওয়া যায়। এই সব শোষক অতিথিদের মধ্যে কয়েকটী খুব উল্লেখযোগ্য কীটের নাম করা যায়, যেমন এক অদ্ভুত ধরণের গুবরে পোকা ও লোমচুষা নামক এক কীট।

লোমচুষারা হিংস্র ফর্ম্মিকাদের রাজ্যে বাস করে। যে সব রাজ্যে এরা বেশ দলে ভারী হয়ে বাস করে সে রাজ্যে মিশ্র জাতীয় জীবের বেশী সৃষ্টি হয়। এই মিশ্র-জাতি ভারি অদ্ভুত ধরণের। এদের অর্দ্ধেক অঙ্গ হয় পুরুষের আর অর্দ্ধেক অঙ্গ রাণীর।

বড় অতিথি গুবরে পোকারা তাদের শুঁয়ো দিয়ে কর্ম্মী-দের গায়ে শুড়শুড়ি দিয়ে খাবার চায়। এদের পেটটী সোনালী চুলে ভর্ত্তি। এদের গ্রন্থি থেকে যখন রস বেরোয় —সেই রস কর্ম্মীদের দিয়ে তাদের খুসী করে—আর তারা তার বদলে মুখ থেকে খাবার বের করে ওদের খাওয়ায়।

এসকল পরগাছা পোকাদের সকলের গ্রন্থিরসের স্বাদ একরকম নয়। প্রায় প্রত্যেকেরই রস বিভিন্ন এবং তাদের মাদকতাও বিভিন্ন। যেমন নানারকমের মদ আছে

পিপীলিকার পাহাড়

[মধ্য আফ্রিকায় টার্মাইট নামক একপ্রকার পিপীলিকার বাস

এবং তাদের আস্বাদও ভিন্ন রকমের ; এদেরও রস সেই রকমের। বিভিন্ন কর্ম্মীদের রুচি অনুসারে এই সব পোকাদের যত্ন করা হয়। তবে সকলেই একটা না একটা পরগাছার ভক্ত।

এই কেন্নোটিকে ঘাড়ে করে শিকারী পাথরের নীচের বাড়ীতে ফিরে আস্‌ছে। কেন্নো এদের প্রধান খাদ্য। দূর থেকে একটি পিঁপড়ে আনন্দে বড় বড় দাঁত ও দাড়া দেখাচ্ছে। ডানাওয়ালা পুরুষটি পাথরের উপর বসে আছে।

পরগাছারা যেমন মূল গাছের রস শুষে খায়, তেমনি এরা আশ্রয়দানকারীদের খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করে। নিজেরা কোন পরিশ্রম করে না। এর ফলে পরিশ্রম করবার উপযুক্ত বলশালী বা কর্ম্মক্ষম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

অধিকারী এরা হয় না। জন্ম থেকেই এরা অলস ও পরমুখাপেক্ষী। যদি পিঁপড়েরা এদের খাবার না দেয় এরা না খেয়ে মরবে। পিঁপড়েদের খেয়াল অনুসারে বংশানুক্রমে এই সব ভবঘুরে অকর্ম্মাদের সৃষ্টি চলেছে। অবশ্য এদের খোসামোদ বা ভিক্ষে করবার জন্মগত শক্তির উপযোগী দু'একটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি এমনভাবে হয়েছে তা দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। পিঁপড়েদের গায়ে শুঁয়ো বুলিয়ে এরা খাবার চায়। এই শুঁয়োগুলো ঠিক শুড়শুড়ি দেবার জন্যই তৈরী হয়েছে ; এ ভিন্ন এ আর কোন কাজই করতে পারে না। এদের মুখের দাড়া ও মুখ এমন ভাবে তৈরী হয়ে গেছে যে, পিঁপড়েরা যখন নিজের পেট থেকে বের করে খাবার মুখের কাছে নিয়ে আসে, তখন অনায়াসে নিজেরা সেই খাবার খেতে পারে।

এদের গ্রন্থির রস পিঁপড়েদের কাছে এমন মিষ্টি ও এমন নেশার সৃষ্টি করে যে, ভীষণ বিপদের মুখেও পিঁপড়েরা এদের ছেড়ে যায় না, বরং এদের ঘাড়ে করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। এর ফলে এদের বিপদ বড় কম হয় না ; —শত্রুর কাছে প্রাণ পর্য্যন্ত হারায়।

নেশাখোর শুধু মানুষই হয় না! পিঁপড়েরাও!

—শেষ—